খুদে প্রতিভা • আমার ইচ্ছেমতো • সুদোকু • করবে কী

৫ জুন ২০১৭

আনন্দমেলা

বিশ্বের আজব বাড়ি

নানা জায়গায় রয়েছে নানা ধরনের বাড়ি। কোনওটা বাঁকা। কোনওটা উলটো। কোনওটা মহাকাশযানের মতো

আই পি এলের ভবিষ্যতের তারকারা

চারটি জমজমাট গল্প

নাসার সূর্য অভিযান • শুরু হচ্ছে ফিফা কনফেডারেশন কাপ

ওষুধের মাত্রা নয় তার শক্তি বাড়ান

ওষুধের সঙ্গে জোলি তুলসী-51 ড্রপ্‌স ব্যবহার করুন

যদি আপনি কোনও অসুখের জন্য আগে থেকে ওষুধ খান, তাহলে জলের সঙ্গে জোলি তুলসী-51 ড্রপ্‌স-এর পাঁচ ফোঁটা মিশিয়ে তারপর ওষুধ খান, এতে ফলাফল খুব ভাল পাবেন।

জোলি তুলসী-51 ড্রপ্‌স সেবন অর্থাৎ একশো ভাগ রোগ থেকে মুক্তি

ত্বকের রোগ
ম্যালেরিয়া, জন্ডিস
কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি
পেটের রোগ
লিভারের রোগ
মুখের দুর্গন্ধ
দুর্বল বুদ্ধি
ভুলে যাওয়ার সমস্যা

সর্দি, অ্যালার্জি
নার্ভের সমস্যা, কাশি
কফ, শ্বাসজনিত রোগ
অনিদ্রা
উৎকণ্ঠা, মাথাব্যথা
চুল পড়ে যাওয়া
মাইগ্রেন
গাঁটের ব্যথা

পাঁচ ধরনের তুলসীর সংমিশ্রণে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি

Helpline:
98143-30500

JOLLY

তুলসী 51 ড্রপ্‌স

ইমিউনিটি বাড়ায় প্রাকৃতিকভাবে

ব্রণ, ফুসকুড়ি, সাদাভাব, সানবার্ন, দাগ-ছোপ, চামড়া কুঁচকে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যে কোনও ক্রিমের সঙ্গে জোলি তুলসী 51 ড্রপ্‌স-এর পাঁচ ফোঁটা মিশিয়ে লাগালে চেহারায় আসবে উজ্জ্বলতার ছোঁয়া।

চুল পড়া, খুসকি, শুষ্কভাব, ডগা ফাটা চুল, অসময়ে চুল পেকে যাওয়া রোধ করতে ব্যবহার করা যে কোনও হেয়ার অয়েলের সঙ্গে জোলি তুলসী 51 ড্রপ্‌স-এর পাঁচ ফোঁটা মিশিয়ে লাগালে ভাল ফল পাবেনই।

মেডিক্যাল স্টোরে গিয়ে তুলসী নয়, জোলি তুলসী 51 ড্রপ্‌স কিনুন। একইরকম নাম থেকে সাবধান, খুব সতর্ক থাকবেন। ভারতে সবচেয়ে বেশি বিক্রীত ভরসাযোগ্য ও আসল ওষুধ জোলি তুলসী 51 ড্রপ্‌স-এর নাম দেখে তবেই কিনুন।

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.allmagazine.in

Click here

আনন্দমেলা

৪৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা ৫ জুন ২০১৭ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

কমিক্স

প্রচ্ছদ কাহিনি

বিশ্বের আজব বাড়ি ৮

কোনও বাড়ি উলটো, কোনও বাড়ি বাঁকা, কোনও বাড়ির আকার মহাকাশযানের মতো, আবার ঝরনা রয়েছে কোনও বাড়িতে। পৃথিবীর নানা প্রান্তের এমন সব অদ্ভুত বাড়ি নিয়ে লিখেছেন **জয়দীপ চক্রবর্তী**

জমজমাট চারটি গল্প

পাঁচুমিস্তিরির হিসেব
কৌশিক পাল ২২

বিছানার নীচের রাক্ষসটা
সায়ন দাস ২৮

মিতুলের বুদ্ধি
জয় সেনগুপ্ত ৩৪

সন্ধি
তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৩৮

ধারাবাহিক উপন্যাস

পিংলাটুলির ইউ এফ ও
শ্যামল দত্তচৌধুরী ৪২

আনন্দমেলা এবার ওয়েবসাইটে: **www.anandamela.in**

সূচিপত্র

দস্যি ডেনিস ৫

নিয়মিত বিভাগ

খুদে প্রতিভা ৬
আমার স্কুল ১ ১৮
আমার স্কুল ২ ২০
আমার কুইজ় ২৭
আমার ইচ্ছেমতো ৩৩
আমার বন্ধু, আমার ছবি ৩৭
শব্দসন্ধান, নিজের হাতে ৪১
যা হয়েছে যা হবে ৪৯
ফারাক পাও, সুদোকু ৫০
আমার বই, লাইফস্টাইল ৫১
করবে কী ৫২
আমার রাজ্য ৫৩
নতুন খেলা ৫৮

খেলাধুলো

আই পি এল এবং ভবিষ্যতের তারকা
স্বর্ণাভ দেব ৫৪

ছোট ছোট খেলা
চন্দন রুদ্র ৫৬

এগজ়িকিউটিভ এডিটর, বাংলা ম্যাগাজ়িন: পৌলোমী সেনগুপ্ত

সম্পাদক: সিজার বাগচী

দাম: কুড়ি টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

ছোটদের বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চট্‌জলদী কবিতা ১৫০.০০
বাদশাহী গল্প ১৫০.০০

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভোঁদড় বাহাদুর ৬০.০০

বিপুলরঞ্জন সরকার
গল্পকথায় গাঁধীজি ২৫০.০০

সুকুমার রায়
আবোল তাবোল ১০০.০০
খাই খাই ১০০.০০
ঝালাপালা ১৫০.০০
পাগ্‌লা দাশু ১০০.০০
বহুরূপী ১০০.০০
হ য ব র ল ৬০.০০

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
অচিন-দেশে ১০০.০০

সুনির্মল বসু
ছোটদের পুরাণের গল্প
১৫০.০০

সুপ্রিয়া ঘোষ (অনুবাদ)
রুশ উপকথা ১৫০.০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আম আঁটির ভেঁপু ৮০.০০
চাঁদের পাহাড় ৮০.০০

লীলা মজুমদার
সব ভুতুড়ে ৩০০.০০

চাঁদের পাহাড়
৩০০.০০

ছবি: সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়
পরিকল্পনা ও চিত্রনাট্য: অভিজিৎ সুকুল

সিগনেট প্রেস

একটি আনন্দ প্রকাশনা

সিগনেট বুক শপ • ১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ফোন ২২১৯০০৪৭

সিগনেটের বই পাওয়া যাবে আনন্দ-র সমস্ত গ্রন্থবিপণিতে

দস্যি ডেনিস

আনন্দগান

গরমকালের সন্ধেবেলা। তুমি পড়ার ঘরে পড়ছ। হঠাৎ লোডশেডিং। আর পড়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল এক ছায়ামূর্তি। তারপর কী হল? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

সেদিন ছিল রবিবার। আমি বাড়িতে একা। বিকেলবেলা খেলাধুলো করে বাড়ি ফিরেছি। মেন গেটটা খোলা রেখেছিলাম আমাদের বাড়ির কাজের বুড়িপিসির জন্য। সন্ধে হয়ে এল। বুড়িপিসি এখনও এল না। আমি পড়তে বসেছি। হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন বলে উঠল, "কারেন্ট গেল।" সত্যি ঠিক তখনই কারেন্ট চলে গেল। এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। সারা পাড়া অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। খুব ভয় পাচ্ছিলাম। দরজার দিকে তাকালাম। দেখি কার যেন একটা ছায়া। ছায়াটার হাতে যেন একটা কী! আমার গা-হাত-পা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে এল। আমি ভয়ে ছায়াটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে তুমি? কী চাও?" ছায়াটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি প্রায় অজ্ঞান। হঠাৎ কারেন্ট চলে এল। দেখি কী ছায়াটা ছিল বুড়িপিসির। সে ঝাড়ু নিয়ে এসেছিল। বুড়িপিসি কথা বলতে পারে না, তাই আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি। তখন আমি ভাবলাম, 'সত্যি আমি খুব ভিতু।'

ঐশীকি পাল
পঞ্চম শ্রেণি, অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বেলঘরিয়া, কলকাতা।

তৃতীয়

হঠাৎ লোডশেডিং। পড়ার ঘরের দরজার সামনে এক ছায়ামূর্তি। অন্ধকারে চিনতে পারলাম না। "কে ওখানে?" "আমি এক পরিচালক। জাদুকরের কথা শুনি। আমার আবার কী পরিচিতি!" কথাগুলো খুব চেনা লাগল, বললাম, "তুমিই কি তা হলে সেই বিখ্যাত অস্কার ওয়াইল্ডের স্টার চাইল্ড?" "হ্যাঁ।" এই সেই যে এত কষ্ট ভোগ করেছে, যাকে পরিচারকের হয়ে কাজ করতে হয়েছে...সে আমার মনের কথা বুঝতে পারল। "আমি আমার কর্মফল ভোগ করেছি। নিজেকে একসময় আমি আকাশের উজ্জ্বল তারার সন্তান বলে অহংকার করেছি, নিজের ছোট ভাইবোনদের তাচ্ছিল্য করেছি।" আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। "তুমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার মায়ের দেখা পাবে, কিন্তু তুমি এখানে কেন?" সে ডুকরে কেঁদে উঠল। "আমাকে জাদুকর টাকা আনতে বলেছে।" টেবিলে দশ টাকার দিকে চোখ গেল, মা পেন কিনতে দিয়েছেন। সেটাই আমি ধীরে-ধীরে উঠে ওর হাতে দিলাম। ও খুব খুশি হল। হঠাৎ কারেন্ট চলে এল। এ কী ঘর ফাঁকা! কিন্তু তারপরেই চোখে পড়ল টেবিলের উপর রাখা একটা সোনার চাদর, একটা তৈলস্ফটিকের চেন ও একটুকরো কাগজে লেখা, 'স্টার চাইল্ড'।

ঐন্দ্রিলা রানা
সপ্তম শ্রেণি, শ্রী শিক্ষায়তন স্কুল, কলকাতা।

দ্বিতীয়

নজরুল জয়ন্তীর কিছুদিন পরের এক সন্ধের ঘটনা। আমি ঘরে বসে পড়ছি। আকাশের অবস্থা একদম ভাল নয়। যে-কোনও সময় ঝড় উঠতে পারে। হঠাৎ লোডশেডিং। আর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রবল ঝড় উঠল। আমি চার্জার আনতে যাব বলে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। হঠাৎই দেখলাম দরজায় একটা ছায়ামূর্তি। আমি খুবই ভয়ার্ত কণ্ঠে বললাম, "কে?" মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আমায় ভয় পেয়ো না। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না।" আমি বললাম, "কিন্তু তুমি কে?" সে বলল, "আমার নাম না হয় নাই জানলে। সেদিন তোমার 'রাজভিখারি' কবিতাটি খুব ভাল হয়েছে। তাই আমি তোমাকে একটি পুরস্কার দিতে চাই।" হঠাৎ মনে হল আমার মাথাটা ঘুরছে। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার চোখে জলের ছিটে পড়ল। সঙ্গে মা-বাবার চিৎকার। "টুপুর, টুপুর।" আমি উঠে বসলাম। দেখলাম কারেন্ট চলে এসেছে। পড়ার টেবিলে একটা 'সঞ্চিতা' রাখা। তার প্রথম পাতায় লেখা 'ছোট্ট অভীপ্সিতার জন্য'। সেদিন কে এসে এই উপহার দিয়ে গেল তা আমার কাছে আজও রহস্য।

অভীপ্সিতা ঘোষ
ষষ্ঠ শ্রেণি, মেমারি রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান।

চতুর্থ

প্রচণ্ড গরমের সন্ধেবেলায় পড়ছি। হঠাৎ লোডশেডিং। যদিও বা তা আমার কাছে হঠাৎ নয়। প্রতিদিনের মতো একটা মোমবাতি নিয়ে এসে পড়ার ঘরে যেই রেখেছি, দেখলাম দরজায় দাঁড়িয়ে এক ছায়ামূর্তি। লোডশেডিং আমার চিরকালের চেনা হলেও ছায়ামূর্তি আমার চেনা নয়। মুহূর্তের মধ্যে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। ছায়ামূর্তি ক্রমশ আমার দিকে অগ্রসরমান। যখন তিনি আমার টেবিলের উপর রাখা মোমবাতির আলোর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বুঝলাম তিনি আমার প্রিয় শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তাঁকে বললাম, "আমাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।" তিনি হাসিভরা মুখ নিয়ে বললেন, "আমি তো মুক্ত এখন। ঘুরে বেড়াই আর গান খুঁজি, আসল গানের মানুষদের খুঁজি। তুমি যখন আজ বিকেলে গান প্র্যাকটিস করছিলে,তখন তোমার গান শুনছিলাম একমনে। আমায় একটা গান শোনাও।" ধরলাম তাঁর গাওয়া শেষ গান 'আমি তোমারি তোমারি তোমারি নাম গাই..." হঠাৎ মায়ের গলা ভেসে এল, "পড়তে বসে গান করছিস কেন? পড়া মনে থাকবে না।" স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল, কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন একথা অস্বীকার করব কী করে? মনে-মনে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করলাম। বললাম "কীর্তি যস্য স জীবতি।"

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য
অষ্টম শ্রেণি, শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

পঞ্চম

একদিন গরমকালের সন্ধেবেলা পড়ার ঘরে একা-একা মন দিয়ে পড়ছি। একটা দমকা হাওয়া দিয়েই ব্যস! লোডশেডিং। এর পর ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাবা-মা কেউ নেই। বাজারে। হঠাৎ একটি ছায়ামূর্তি আমরা সামনে নজরে এল। না, আমাদের বাড়ির কেউ এত খাটো নাকি? ছায়ামূর্তিটির উচ্চতা মেরেকেটে দেড় ফুট। আমার একপাও এগোনোর সাহস নেই, ওই ছায়াটি দেখে। তারপর বাবা-মা এসে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন। আমার তখন কী ভয়ঙ্কর হাল! মুখ থেকে শব্দ বেরচ্ছে না। এগোনোরও ক্ষমতা নেই। ভাগ্যিস, তখন কারেন্ট চলে এসেছিল! তারপর দেখি বাড়ির বিড়ালটা। তখন বাবা-মাকে দরজা খুলে দিলাম। মা বললেন যে, এতক্ষণ দরজা খুলছিলাম না কেন। উত্তর দিলাম, "বিড়ালটার জন্য।" তারপর আর কিচ্ছু না বলে পড়া রেখে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম সেদিন। কিচ্ছু মনে নেই তারপর কী হয়েছিল।

তনিকা রায়
পঞ্চম শ্রেণি, চাকদহ বসন্তকুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ, নদিয়া।

আরও যারা ভাল লিখেছে

সৃঞ্জয় রায়চৌধুরী
সপ্তম শ্রেণি, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

স্বর্গদ্যুতি দাস
ষষ্ঠ শ্রেণি, অশোকনগর বাণীপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগনা।

সৌরাশিস চক্রবর্তী
চতুর্থ শ্রেণি, শ্রী অরবিন্দ শিক্ষা নিকেতন, কৃষ্ণনগর, নদিয়া।

সায়ন্তন পাত্র
চতুর্থ শ্রেণি, রানি ইন্দিরাদেবী শিক্ষাসদন, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর।

সোমশ্রী দেব
সপ্তম শ্রেণি, কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির, চন্দননগর, হুগলি।

কস্তুরী সিংহ
দ্বিতীয় শ্রেণি, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিদ্যামন্দির, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

সৌম্য দাস
অষ্টম শ্রেণি, তমলুক হ্যামিলটন হাই স্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর।

সোমদত্তা সিংহ
পঞ্চম শ্রেণি, বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

কঙ্কনা মিত্র
পঞ্চম শ্রেণি, হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

বিদিত্বা চট্টোপাধ্যায়
তৃতীয় শ্রেণি, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট, ব্যান্ডেল, হুগলি।

শ্রমন্তিকা সেন
সপ্তম শ্রেণি, অশোকনগর বাণীপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগনা।

এবারের প্রতিযোগিতা

দারুণ বৃষ্টিতে কত জায়গায় জল জমে যায়। সত্যি যদি সারা বছর এরকম নদী হয়ে থাকে, তা হলে কেমন লাগবে? কীভাবেই বা স্কুলে যাবে? যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, তারাই লিখে পাঠাও ২৮ জুনের মধ্যে। শব্দসংখ্যা ১৫০। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৫ জুলাই সংখ্যায় ছাপব। খামের উপর কোন সংখ্যার খুদে প্রতিভা পাঠাচ্ছ, মনে করে লিখবে। ঠিকানা: 'খুদে প্রতিভা', 'আনন্দমেলা', ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

বিশ্বের আজব বাড়ি

বাড়ি তৈরির নকশায় কত রকম চমক দিয়েছেন স্থপতিরা। তাই তো বাস্তবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আজব দেখতে সব বাড়ি। বিশ্বের তেমনই কয়েকটি বাড়ির কথা লিখেছেন **জয়দীপ চক্রবর্তী**

এক সময় মানুষ ছিল অরণ্যচারী। বন-জঙ্গল, গাছের ডাল ছিল তার থাকার জায়গা। আর খাবার বলতে গাছের ফল কিংবা বনের জন্তু-জানোয়ার। তারপর রোদ-ঝড়-বৃষ্টি আর বুনো জন্তুদের থেকে বাঁচতে পাহাড়ি গুহায় ঠাঁই নিল মানুষ। এভাবেই এগিয়ে চলছিল মানবসভ্যতা। প্রস্তর যুগে পাথর, বন্যজন্তুর হাড়, গাছের ডালপালা দিয়ে প্রথম ঘর বানাতে শিখল মানুষ। আরও পরে তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহ যুগে মানুষের ঘর বানানোর কৌশল আরও পোক্ত হল। রোদে পোড়া মাটির ইট আর কাদা মাটির ব্যবহার শুরু হল। একতলা থেকে বাড়ি দোতলা হল। ঘরবাড়ি বানানোয় মানুষের মুনশিয়ানা কতটা বেড়ে গিয়েছিল তা বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতা, সুমের (মেসোপটেমিয়া) সভ্যতা আর হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার নিদর্শনগুলোর দিকে তাকালে। কিংবা যদি ভাবি, আজ থেকে চার হাজার ছ'শো বছরেরও আগে মিশরের এক ফ্যারাও জোসারের সমাধির জন্য ২০০ ফুট উঁচু পিরামিড বানানো হয়েছিল।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ি তৈরির ধারণাও ক্রমশ বদলে গিয়েছে। আজও বিশ্বে রাজা-মহারাজার সাতমহলা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে গরিবের কুঁড়েঘর সমান সম্মানের সঙ্গে টিকে রয়েছে। এক দিকে বৈভব-প্রাচুর্যের অশেষ আয়োজন। অন্য দিকে প্রয়োজনের

মাথা গোঁজার ঠাঁই। বড়-ছোট-মাঝারি নানান বাড়ির মাঝে কিছু আজব দেখতে বাড়িও রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই বাড়িগুলো দেখলে চমক লেগে যায়। বিশাল রাজপ্রাসাদ তারা নয়। আবার তাজমহল বা পিরামিডের মতো কোনও স্মৃতিসৌধও সেগুলো নয়। নিতান্তই থাকার জন্য বা হোটেল, রেস্তরাঁর জন্য এমন সব বাড়ি তৈরি হয়েছে। যা দেখলে বাড়ির মালিক, বাড়ির নকশাকার আর বাড়ি যিনি বানিয়েছেন সেই স্থপতিকে, খ্যাপা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। সবগুলো কিন্তু বিজ্ঞান মেনেই তৈরি হয়েছে। অবশ্য বিজ্ঞানও তো একধরনের খ্যাপামি! গতানুগতিককে ভেঙেচুরে, নতুন কিছু করে তাক লাগিয়ে দেওয়ার নেশায় এমন সব বাড়ি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। এক-একটা এক-এক ধরনের অদ্ভুতদর্শন। তেমনই কয়েকটা বাড়ির কথা এবার জেনে নেওয়া যাক।

গাছবাড়ির গ্রাম

জঙ্গলে গাছবাড়ির কথা আমরা জানি। এবার সেই গাছবাড়ি দিয়েই একটা গোটা গ্রামের জন্ম হয়েছে কোস্টা রিকায়। মধ্য আমেরিকার কোস্টা রিকা দেশটির এক পাশে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্য পাশে ক্যারিবিয়ান সাগর। পাহাড়, জঙ্গলে ঘেরা এই দেশে বছরে প্রায় ছ'-সাত মাস বৃষ্টি হয়। দেশের এমন এক বৃষ্টিস্নাত জঙ্গলে এগারো বছর আগে, আমেরিকার কলোরেডো প্রদেশ থেকে এক দম্পতি এসে ৬২ একর জমি কেনেন। ইচ্ছে ছিল, পর্যটকদের জন্য জঙ্গল কেটে বাড়ি-ঘর করবেন তাঁরা। চাষ করার পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু জঙ্গল আর প্রকৃতির ভালবাসায় পড়ে তাঁদের ভাবনাটাই গেল বদলে। গাছ কাটার বদলে গাছের মধ্যেই বাড়ি তৈরি করে থাকতে লাগলেন তাঁরা। তারপর আরও বাড়ি তৈরি হল। তা বিক্রিও করা হল। এভাবে চলতে-চলতে আজ ৬০০ একর জঙ্গলের মালিক সেই দম্পতি। কোস্টা রিকার জঙ্গলে তৈরি করে ফেলেছেন গাছবাড়ির গ্রাম। যেখানে দড়ির মই, দড়ির ব্রিজ কিংবা দড়ির পুলিতে চড়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছতে হয় বা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে হয়।

৮০ ফুট উঁচুতে গাছবাড়ির বারান্দা

মাটি থেকে কোনও-কোনও গাছবাড়ি ৮০-৯০ ফুট উঁচুতে। এখন অনেকেই এসে থাকছেন সেখানে। ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

গাছবাড়ির এই গ্রাম থেকে সবচেয়ে কাছের জনপদ প্রায় দেড় মাইল দূরে। সেখানে খেলার মাঠ, গির্জা, দোকানবাজার আছে। জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা হয় সেখান থেকে। বাকি সব গাছবাড়িতেই পাওয়া যাবে। বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, পাহাড়ের ঝরনার জলের ব্যবহার, জীবাণুনাশক ফিল্টার, ওয়াই-ফাই সবই রয়েছে গাছবাড়িতে। স্বামী ম্যাট হোগান নিজেই গাছবাড়ির নকশা করেন। প্রতিটি বাড়ির নকশা একে অন্যর চেয়ে আলাদা। কোন গাছে বাড়ি তৈরি করা যাবে, সেটা কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। গাছের মূলের গভীরতা কত, গাছের বয়স কত, গাছবাড়ি তৈরির জন্য এসব তথ্য খুব জরুরি। স্ত্রী এরিকা এরিস এনড্রুজ খেয়াল রাখেন বাকি দিকগুলোয়। আজ তাঁদের গাছবাড়ির গ্রাম 'ফিনিকা বেলাভিস্টা'র নাম গোটা বিশ্ব জানে। যেখানে রান্নাঘরের বাগানে সবজি আর ফলের চাষ হয়। রাতে শুতে যাওয়ার সময় ব্যাঙের ডাক, রাতচরা পাখির ডাক, জঙ্গলের নানা জীবজন্তুর ডাক কানে ভেসে আসে। আবার সকালে পাখির কিচিরমিচিরে ঘুম ভাঙে। এখন প্রায় পঞ্চাশটির মতো গাছবাড়ি রয়েছে এখানে। প্রকৃতিকে ভালবেসে, তাকে আগলে রেখে, প্রকৃতির কোলে এমন নিবিড় আশ্রয়ের উদাহরণ দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর-একটিও আছে কিনা সন্দেহ।

ঘোরানো বাড়ি

একটা বাড়ি, সুবিধেমতো সেটাকে ঘোরানো যায়, লম্বা করে উঁচুতে তোলা যায় আবার কখনও নীচেও নামানো যায়। ঠিক যেন পেরিস্কোপ। বাড়িতে একটা সুইমিং পুলও আছে। চারদিকে জানলা। সন্ধে না হওয়া পর্যন্ত সূর্যের আলোকে কখনই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। যে দিকে সূর্য, বাড়ি সেদিকে ঘুরিয়ে নিলেই হল। তবে এই ঘোরানোর কাজটা কিন্তু নিজের শক্তিতেই করতে হবে। কেবল সুইচ টিপে হবে না।

চেক প্রজাতন্ত্রের ভেলকো হামরি শহরে গায়ে ঘোরানো বাড়ি

চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী শহর প্রাগ থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভেলকো হামরি নামে ছোট্ট এক শহর আছে। সেখানে এমনই চমকে দেওয়া বাড়ি বানিয়েছেন সেদেশের পরিচিত স্থাপত্যবিদ বোমিল হোতা। নিজে বলেছেন যে, পেশার তাগিদে অন্যদের জন্য একই ধরনের বাড়ি বানাতে-বানাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাই নিজের বাড়িটা একটু ভেবেচিন্তে অন্য রকম করার পরিকল্পনা করেন।

১৯৮১ সালে বাড়ি তৈরি শুরু করেন বোমিল। শেষ করেন ২০০২ সালে। পাহাড়ি এক টিলার উপর এই বাড়িটি তৈরি। একতলায় ঘোরানো সিঁড়ি, সুইমিং পুল, বাড়ি ঘোরানোর সব কলাকৌশল রয়েছে। বাড়ির একতলা মাটির নীচে। তাই গরম এবং শীতকালে নিজে থেকেই বাড়ির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। দোতলায় বাকি সব কিছু। শোয়ার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম।

বোমিল হোতা নিজের হাতে ঘুরিয়ে নিচ্ছেন বাড়িকে

গোল বাড়িটা দেখতে অনেকটা মহাকাশে পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহের মতো। মাঝখানটা পুরোটাই জানলা। বাড়ির বসার ঘরে বসে সেই জানলা দিয়ে দূর পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। প্রকৃতির সেই অপার সৌন্দর্যের আয়োজন দেখতে-দেখতেই এখন সময় কেটে যায় বোমিলের। অবশ্য কোনও দৃশ্য একঘেয়ে লাগতে শুরু করলে আবার বাড়িটা একটু ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে অন্য দৃশ্যে চলে যান তিনি। কারণ, প্রয়োজনে বাড়িটি ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফেলা যায়।

স্পেস হাউজ়

১৯৬৬ সালে আমেরিকায় প্রথম 'স্টার ট্রেক' টিভি সিরিয়ালের প্রদর্শন শুরু হয়। ক্যাপ্টেন জেমস ক্রিক আর তাঁর মহাকাশযান 'ইউ এস এস

আমেরিকার টেনেসি প্রদেশে সিগন্যাল পাহাড়ের ঢালে স্পেস হাউজ়

এন্টারপ্রাইজ়'কে নিয়ে নানা গল্প সেসময় মার্কিন দেশে খুব জনপ্রিয় হয়। পরে অবশ্য গোটা দুনিয়াতেই সেই জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। ইউ এফ ও আর এলিয়েনদের নিয়ে নানা জল্পনা আর গুজব-গল্প তখন সকলের কাছে খুব প্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৭২ সালে 'স্টার ট্রেক' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কার্টিস কিং নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক তাঁর ছেলের আবদারে, মহাকাশযানের আদলে নিজেদের থাকার বাড়িটি তৈরি করলেন। স্টিল আর কংক্রিট দিয়ে বাড়ি বানাতে খরচ হল প্রায় আড়াই লক্ষ মার্কিন ডলার। আমেরিকার টেনেসি প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে চাটানুগা শহর। সেই শহরে প্রান্তে সিগন্যাল পাহাড়ের ঢালে রয়েছে হালকা জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে আমেরিকার ১২৭ নম্বর হাইওয়ে। সেই রাস্তার ধারেই কিং এই বাড়ি তৈরি করলেন। যা 'স্পেস হাউজ়' বা 'ইউ এফ ও হাউজ়' নামে পরিচিত। তবে কয়েক বছর থাকার পর তাঁরা বাড়িটি বিক্রি করে দেন। এখন নানা হাত ঘুরে, আপাতত বাড়িটি গেস্ট হাউজ় হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়।

দু'হাজার স্কোয়ার মিটারের বাড়ির ভিতর তিনটি শোয়ার ঘর রয়েছে। রয়েছে দুটো বাথরুম, বসার ঘর। মাটি থেকে বাড়ির ভিতরে ঢোকার জন্য পোর্টেবল সিঁড়ি আছে। দরকারে তা নেমে যায় আবার ঠিক মহাকাশযানের মতো, কাজ মিটলে গুটিয়ে যায়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন চারটে স্তম্ভের উপর সত্যিই কোনও মহাকাশযান দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির ঘর, বাথরুম, বসার জায়গা, দরজা, খাট-বিছানা, চেয়ার, বাথটব সবই গোল-গোল। তবে ভিতরটা চূড়ান্ত আধুনিক সব জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো। বাইরে থেকে দেখলে যা মনেই হয় না।

বাঁকা বাড়ি

আজ থেকে সতেরো-আঠারো বছর আগে মিলেনিয়ামের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে

পোল্যান্ডের সোপত শহরের বাঁকা বাড়ি

পেনসিলভেনিয়ার অ্যাপ্লেশিয়ান পাহাড়ে বেয়ার রান জলপ্রপাতের উপর নির্মিত বাড়ি

নতুন-নতুন ভাবনা-চিন্তার বিস্তার ঘটল সারা পৃথিবীতেই। তারপর ছক ভেঙে, পুরনো ধারণা ভেঙে বেরিয়ে এসে আমাদের চমকে দিয়েছেন বিজ্ঞানী থেকে শিল্পী, কবি থেকে গবেষক সকলেই। তেমনই এক ঘটনা ঘটে পোল্যান্ডে।

পোল্যান্ডের উত্তর ভাগে বাল্টিক সাগরের ধারে সোপত শহর। খুবই প্রাচীন শহর। পর্যটকদের খুব প্রিয় জায়গা। সেই শহরের মাঝে নতুন শপিং মল, বিজ়নেস সেন্টার, হোটেল, এমন সব হবে বলে 'রেজ়িদেন্ত' কমপ্লেক্স বানানোর বরাত পেলেন স্থানীয় শোতেইস্কি দম্পতি। সেটা ২০০১ সাল। স্বামী, স্ত্রী দু'জনেই স্থপতি। নতুন শতাব্দীতে নতুন কিছু করার তাগিদে তাঁরা বেছে নিলেন রূপকথাকে। বিখ্যাত পোলিশ শিল্পী ইয়াম মার্চিল শনজ়ারে গল্পের বাঁকাচোরা কাল্পনিক বাড়ির আদলে তৈরি করলেন কমপ্লেক্সের একটা অংশ। স্থাপত্যবিদ্যার প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিল সেই বাড়ি। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় গোটা বিশ্বে। স্থানীয় পোলিশ ভাষায় বাড়িটির নাম 'শিভি দোমেক'। বাংলা করলে 'বাঁকাচোরা বাড়ি'-টাই পোলিশ শব্দের কাছাকাছি হয়। ইংরেজিতে বলা হয় 'ক্রুক্‌ড হাউজ়'। ২০০৪ সালে এই কমপ্লেক্স তৈরির কাজ শেষ হয়। তারপর থেকেই এটি বিশ্বের অদ্ভুত বাড়ির তালিকায় ঢুকে পড়েছে। ছোটদের গল্পের বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা ছবি সেখানে ইট-কাঠ-কংক্রিটের দৌলতে বাস্তবের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয়রা বলেন, আধুনিকতা আর পোলিশ ঐতিহ্যের যুগলবন্দি হল 'শিভি দোমেক'। সোপত শহরের পরিচয়, জনপ্রিয়তা এই বাড়ির কারণে এখন আরও বেড়ে গিয়েছে। তেতাল্লিশ হাজার স্কোয়ার ফুটের এই শপিং মলে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আসেন কাজ করতে, কেনাকাটা সারতে। বিরাম নেই গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা পর্যটকদেরও।

জলপ্রপাত বাড়ি

পাহাড়, জঙ্গল আর জলপ্রপাত। তার মাঝে গোটা একটা বাড়ি। যেন রূপকথার ত্রিবেণী। তবে এ বাড়ি একেবারে জলপ্রপাতের উপরই বানানো। পাহাড়ের বুকে ঘরের মধ্যে জল পড়ার শব্দ, সবুজ প্রকৃতির মায়া ঘেরা পরিবেশ। ১৯৩৫ সালে আমেরিকার পূর্ব প্রান্তের প্রদেশ পেনসিলভেনিয়ায় এই বাড়িটি তৈরি করেন বিখ্যাত মার্কিন স্থাপত্যবিদ ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট। বলা হয়, রাইটের জীবনের সেরা নকশা ছিল এই জলপ্রপাত বাড়ি। তৎকালীন মার্কিন ধনকুবের এডগার জে কফম্যানের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ব্যবসা ছিল। এডগারের ছেলে, জুনিয়র এডগার ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়র। লয়েড রাইটের ছাত্র। একসময় সিনিয়র এডগার পেনসিলভেনিয়ার অ্যাপ্লেশিয়ান পাহাড়ের মাঝে 'বেয়ার রান' জলপ্রপাতের অংশে কিছুটা জমি কিনে নিলেন। বাড়ি বানাবেন বলে।

allmagazine.in

সুইডেনের লাপল্যান্ডে রয়েছে পাখির বাসার আদলে ঘর

ছেলে জুনিয়র এডগারের কথায় সেখানে বাড়ি বানানোর দায়িত্ব দিলেন লয়েডের উপর। লয়েড গোটা জায়গা দেখে, সার্ভে করে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কোনও নকশাতেই ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। অপেক্ষা করতে-করতে আর থাকতে না পেরে একদিন, সিনিয়র এডগার লয়েডকে ফোনে বললেন যে, তিনি যাচ্ছেন লয়েডের অফিসে নকশা দেখতে। অথচ তখনও কোনও নকশা করে উঠতে পারেননি লয়েড। অগত্যা বসে গেলেন বাড়ির নকশা বানাতে। দু'ঘণ্টার মধ্যে এডগার পৌঁছনোর আগেই চটজলদি তৈরি করে ফেললেন একটি নকশা। তবে সেটা সিনিয়র এডগারের পছন্দ হল না। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন বাড়ির সামনে জলপ্রপাত থাকবে। কিন্তু লয়েড তো জলপ্রপাতের উপরই গোটা বাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যা হোক, লয়েডের নকশায় ভরসা রেখেই সেই বাড়ি তৈরি করলেন সিনিয়র এডগার। গেরুয়া আর কালচে লাল রঙের এই বাড়ি আজও স্থাপত্যবিদ্যায় এক মাইলফলক হয়ে রয়েছে। বাড়ি নির্মাণে সেই সময়ে খরচ পড়েছিল প্রায় দেড় লক্ষ মার্কিন ডলার। বর্তমানে এই বাড়ি 'ওয়েস্টার্ন পেনসিলভেনিয়া কনজ়ারভেন্সি'র সম্পত্তি। জুনিয়র এডগার ১৯৬৩ সালে এটি দান করে দেন। পরের বছর সেখানে একটি পরিবেশ মিউজ়িয়াম চালু হয়। প্রতি বছর এক লক্ষেরও বেশি মানুষ আসেন এই বাড়িতে।

পাখির বাসা

উত্তর ইউরোপের একটি স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশ হল সুইডেন। যার এক দিকে নরওয়ে আর অন্য দিকে ফিনল্যান্ড। উত্তর মেরুর কাছে বলে ঠান্ডা আর বরফের অভাব নেই এখানে। সুইডেনে ২৫টি প্রদেশ রয়েছে। যার মধ্যে একদম উত্তর ভাগে রয়েছে লাপল্যান্ড প্রদেশ। এই প্রদেশে লুইলো, বৌদেন নামে দু'টি প্রাচীন শহর রয়েছে। যেখানে পাহাড়ও আছে, সমুদ্রও আছে। আর আছে বেশ কিছু নেচার পার্ক, সংরক্ষিত জঙ্গল। রাষ্ট্রসংঘের 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর মর্যাদা পেয়েছে সেসবের কয়েকটা। এই বৌদেন শহরের পাশের জঙ্গলে ২০১০ সালে প্রথম তৈরি হয় এক গাছবাড়ি। বাড়িটির নাম দেওয়া হয় 'দ্য বার্ডস নেস্ট', পাখির বাসা। বেসরকারি উদ্যোগে এটি তৈরি করা হয় কেবল পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে। জঙ্গলে ঘুরতে এসে সেখানে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা সংগ্রহের

পাখির বাসার অন্দরের চেহারা

জন্য এই পাখির বাসাকেই বেছে নেন পর্যটকরা।
চার দিকে গাছের মাঝে ঝুলে রয়েছে কাঠের বাড়ি। বাইরেটা দেখলে কেউ বলবে না যে, সেটা কোনও মানুষের বাসের উপযোগী কোনও বাড়ি। পাখিরা যেমন ছোট খড়, কাঠি দিয়ে নিজেদের ঘর তৈরি করে, এই গাছবাড়ির বাইরেটা দেখতে অবিকল তেমন। কেবল আকারে বড়। আসলে গাছের ডাল দিয়ে বাড়িটির চারদিক ঘিরে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে জানলাগুলোও দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ বাড়ির ভিতরটা কিন্তু একেবারেই আলাদা। ঝকঝকে আধুনিক সব ব্যবস্থায় সাজানো। প্রায় ২০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা রয়েছে বাড়িটিতে। দুটো বাচ্চা সমেত চারজনের থাকার ব্যবস্থা আছে দুটো ঘরে। স্লাইডিং দরজা, বাথরুম আর কিচেন ক্যাবিনেটও রয়েছে। টিভি, ইন্টারনেট পরিষেবাও পাওয়া যাবে এই পাখির বাসায়। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে এক বিশেষ সিঁড়িতে করে উঠে আসতে হয়। একনজরে, জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারের পুরো মজা আর রোমাঞ্চ ছড়িয়ে রয়েছে এই পাখির বাসার ভিতর।

আমেরিকার ওহিয়ো প্রদেশের নিউয়ার্ক শহরে ঝুড়িবাড়ি

ঝুড়িবাড়ি

সাততলা একটা বাড়ি সেটা একটা ঝুড়ির মতো দেখতে। বিরাট ঝুড়ি! অবশ্য এটা ঠিক থাকার বাড়ি নয়, অফিসবাড়ি। আমেরিকায় ১৯৭৩ সালে ডাভ লংবার্গার হাতে তৈরি জিনিসপত্রের এক সংস্থা তৈরি করেন। ওহায়ো প্রদেশের ড্রেসডেন গ্রামে সংস্থার কাজ শুরু হল। বাঁশের কঞ্চি আর বেত দিয়ে ঝুড়ি, আসবাব, ঘর সাজানোর বিভিন্ন উপকরণ তৈরি হত সেই সংস্থায়। ধীরে-ধীরে লংবার্গারের সংস্থা বিশাল আকার ধারণ করল। ১৯৯৭ সালে লংবার্গার সংস্থার হেড অফিস স্থানান্তরিত হল ওহায়ো প্রদেশের নিউয়ার্ক শহরে। নতুন সেই অফিস বাড়িটি তৈরি হল সংস্থারই তৈরি এক আপেল ঝুড়ির অনুকরণে। কারণ, সংস্থার বাকি সব জিনিসের মধ্যে সেটার বিক্রি ছিল সবচেয়ে বেশি।
অফিস বাড়িটি সাততলা। ছাদের সঙ্গে ঝুড়ির বেল্টের মতো যে স্ট্র্যাপ দুটো রয়েছে সেগুলোর ওজন প্রায় ১৫০ টন। প্রয়োজনে বিশাল স্ট্র্যাপ দুটোকে গরমও করা যায়। মার্কিন দেশে শীতকালে বরফ পড়ার সময় যাতে স্ট্র্যাপের গায়ে বরফ না জমতে পারে তাই এমন ব্যবস্থা।
এক লক্ষ আশি হাজার স্কোয়ার ফুটের এই অফিস বাড়িতে ৮৪টি বড় জানলা রয়েছে। কাঠ, তামা আর স্টিল দিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়িটি। দু'বছর সময় লাগে এটি তৈরি হতে। সেই সময় খরচ হয় তিন কোটি মার্কিন ডলার। লংবার্গারের হেড অফিস চত্বরটি ২৫ একর জায়গা জুড়ে। মাঝে একটি লেকও রয়েছে। ঝুড়ি বাড়িটির বিশেষত্ব হল, আসল ঝুড়ির মতো বাড়িটিরও নীচের দিকটা মাথার তুলনায়। একটু সরু। বাড়ির নীচে অংশের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ হল যথাক্রমে ১৯২ ফুট এবং ১২৬ ফুট। আর মাথার কাছে সেই মাপ ২০৮ ফুট এবং ১৪২ ফুট।

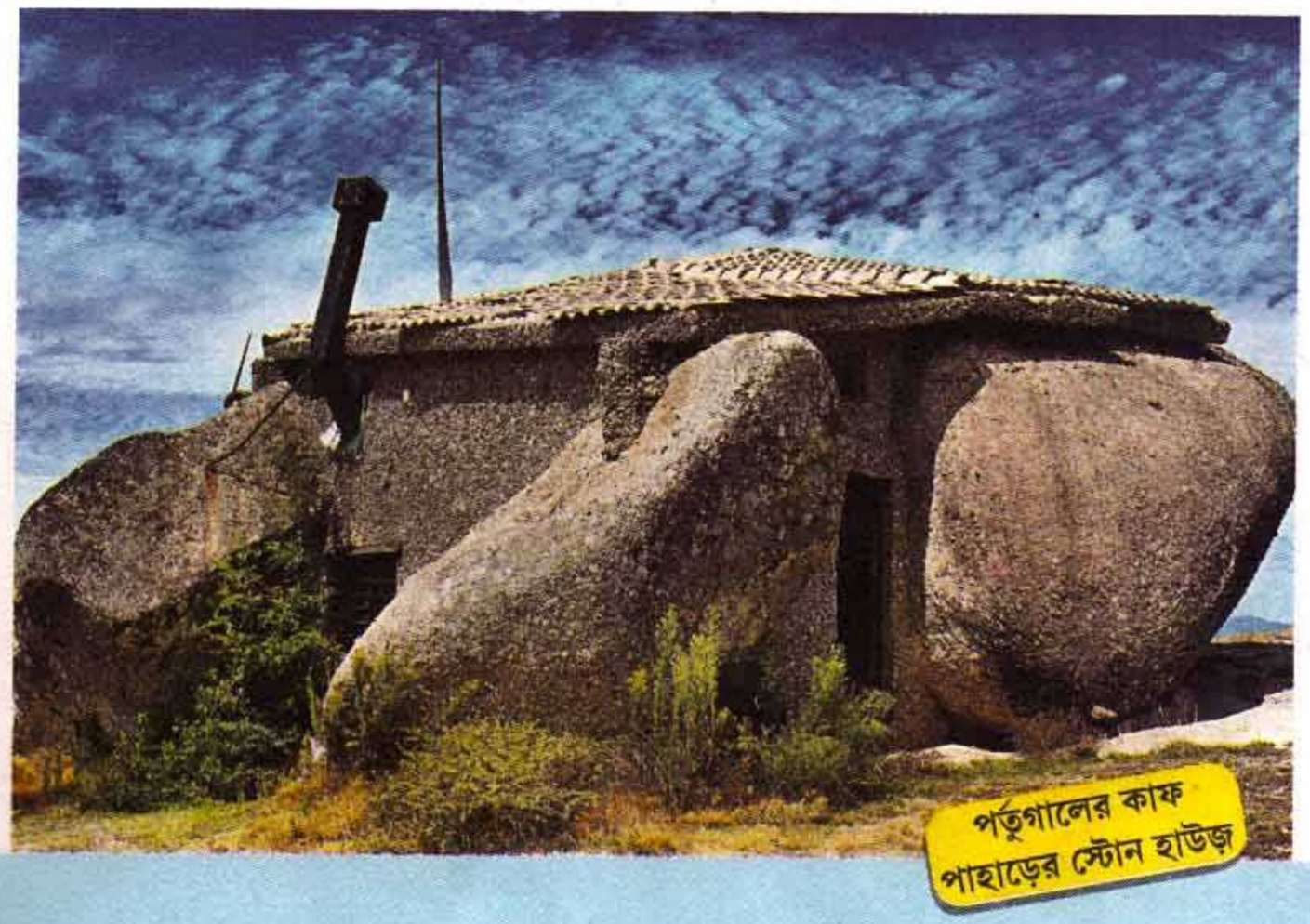
পর্তুগালের কাফ পাহাড়ের স্টোন হাউজ

পাথরের বাড়ি

পাহাড়ের ঢালে চারটে পাথর কেটে বানানো হয়েছে এক বাড়ি। তার জানলায় আবার বুলেটপ্রুফ কাচ লাগানো। ঘরের ভিতর 'ফায়ার প্লেস' রয়েছে। একটা

লেবাননের মিজ়িয়ারা শহরে এয়ারবাসের অনুকরণে তৈরি বাড়ি

বড় পাথর কেটে সুইমিং পুলও বানানো আছে। পর্তুগালের উত্তরে কাজ়া দো পেনেদো শহরের প্রান্তে রয়েছে ফাফ পাহাড়। সেই পাহাড়ের প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে এই স্টোন হাউজ়। যা স্থানীয়ভাবে 'সেলরিকো দো বাস্তু' নামে পরিচিত। এখন সেই বাড়িতে কেউ থাকে না ঠিকই। কিন্তু ১৯৭২ সালে এটি তৈরি হয়েছিল অবসর সময় কাটানোর জন্য। দু'বছর লেগেছিল বাড়িটি তৈরি করতে। পাথুরে বাড়িটির আসল মালিক কে ছিলেন সেটা জানা যায়নি, তবে এখন স্থানীয় প্রশাসন এটিকে মিউজ়িয়াম হিসেবে ব্যবহার করছে। যেখানে পুরনো ছবি আর স্থানীয় ইতিহাসের কিছু স্মারক রাখা আছে।

চারটে গ্র্যানাইট পাথর আর মাথায় কংক্রিটের ছাদ। এই হল বাড়ির কাঠামো। তবে ছাদ কংক্রিটের কিনা তাই নিয়ে মতভেদ আছে। বলা হয়, বাড়িটি বানানো হয়েছিল গত শতাব্দীর ছ'য়ের দশকের বিখ্যাত মার্কিন কমিক্স 'ফিন্টস্টোন্স' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। পরে যে কমিক্স থেকে চলচ্চিত্র তৈরি হয়। পাথরের বাড়ি, পাথরের আসবাব, পাথরের বাসন এমনই পাথুরে সব ব্যাপারস্যাপার ছিল সেখানে। পর্তুগালের স্টোন হাউজ়ে তেমনই পাথরের আসবাব আর সিঁড়ি রয়েছে। যাতে ফিন্টস্টোন্সের প্রভাব খুব স্পষ্ট। এখন সারা বছর পর্যটকদের আনাগোনা চলে এই পাথুরে বাড়িকে কেন্দ্র করে।

এরোপ্লেন বাড়ি

এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের শেষ দেশ হল লেবানন। এক দিকে সিরিয়া, ইজ়রায়েল, জর্ডন আর উলটো দিকে গোটাটাই ভূমধ্যসাগর। এক সময় এই দেশে ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল। এখন স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক দেশ। লেবাননের উত্তর ভাগে পাহাড়ি টিলা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি শহর রয়েছে। নাম মিজ়িয়ারা। এই দেশের বেশির ভাগ লোকের মতো, এই শহরের তরুণরাও দেশের বাইরে চলে যেতেন রোজগারের সন্ধানে। বাইরে ভাল রোজগারপাতি করে তারপর দেশে ফিরে আসতেন তাঁরা। এইভাবেই মিজ়িয়ারায় ফিরে আসা পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজেদের পছন্দমতো বাড়ি বানাতে আরম্ভ করলেন। কেউ গ্রিক মন্দিরের আদলে, তো কেউ পিরামিডের আদলে। কেউ বা এয়ারবাসের আদলে। তাতে এই এলাকা সম্পর্কে আশপাশের মানুষের আগ্রহ বাড়তে লাগল। পর্যটকরাও আসতে শুরু করলেন। এখন তো সরকারও এগিয়ে এসেছে মিজ়িয়ারাকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলতে। যাতে নতুন রোজগারের আশা দেখতে পায় স্থানীয় মানুষেরা। মিজ়িয়ারায় ১৯৭৫ সালে তৈরি হয় এরোপ্লেন বাড়িটি। এয়ারবাস এ৩৮০ মডেলের এই প্লেন আসলে দোতলা একটি বাড়ি। মাটি থেকে এই প্লেনবাড়িতে ঢোকার জন্য সামনে আর পিছনে দুটো সিঁড়ি রয়েছে। প্লেনবাড়ির দু'পাশে রয়েছে সমান সংখ্যার জানলা রয়েছে। প্লেনের পিছন দিকটায় একটা সিঁড়ির ল্যান্ডিং রয়েছে। সামনে বা পাশ থেকে অবশ্য তা দেখা যায় না। সাদা চোখে প্লেনের সঙ্গে পার্থক্য বলতে এইটুকুই। কংক্রিটের স্ল্যাবের উপর চাকা সমেত গোটা প্লেনবাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। যা এখনও মিজ়িয়ারায় আসা পর্যটকদের কাছে মূল

আকর্ষণ। তবে বাড়ির মালিকরা এখন আর এই প্লেন বাড়িতে থাকেন না।

উলটো বাড়ির ভিতর সবই উলটো

উলটো বাড়ি

ছাদ মাটিতে আর মেঝে আকাশের দিকে। যাকে বলে মাথা নীচে, পা উপরে। হ্যাঁ, ঠিক এমনই এক বাড়ি। উত্তর পোল্যান্ডের শিমবার্ক শহরে যা রয়েছে। আসলে এই শহরেই রয়েছে পোল্যান্ডের 'সেন্টার অফ এডুকেশন অ্যান্ড রিজিওনাল প্রোমোশান'। এক রকম মিউজ়িয়াম বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার কাছে পোল্যান্ডের বিধ্বস্ত হওয়া এবং পোলিশদের উপর রাশিয়ার সেনাবাহিনীর অত্যাচারের নানা ঘটনা ইতিহাসের বয়ান থেকে এইখানে রাখা রয়েছে। রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় (৩৬.৮৩ মিটার লম্বা) জোড়হীন কাঠের তক্তা। আরও কত কিছু। তবে এসবের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল মাউন্ট ভিয়েজ়িতা পাহাড়ের নীচের এই উলটো বাড়ি। কাঠ আর কংক্রিট দিয়ে বাড়িটি তৈরি হয়েছে ড্যানিয়েল ফ্লাপিয়েস্কি নামে এক পোলিশ নকশাকারের নকশা অনুসারে। মজার ব্যাপার হল, বাড়ির ভিত তৈরি করতেই গোটা বাড়ির অর্ধেকের বেশি কাঁচামাল লেগে যায়। মাঝে-মাঝেই মিস্ত্রিরা কাজ বন্ধ করে দিতেন। কারণ এমন সব সূক্ষ্ম কোণ, মাপ, জোক করে বাড়ি বানাতে গিয়ে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তাই রেগে গিয়ে কাজ বন্ধ করে চলে যেতেন তাঁরা। পরে আবার তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধরে এনে কাজ শুরু করতেন নির্মাতারা। তাই বাড়ি তৈরিতে সময় লাগে তিন সপ্তাহের বদলে তিন মাস। ২০০৭ সালে এই বাড়ির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। বাড়ির ছাদের দরজা দিয়ে দর্শকদের বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হয়। ভিতরটা সাজানো পঞ্চাশ বছরের পুরনো পোল্যান্ডের বাড়ি ঘরের আদলে। ছাদ দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াতে হয়। মাথার উপর টেবিল-চেয়ার, সোফা, খাট। কারণ মেঝে তো মাথার উপর। তাই অনেক দর্শনার্থীর কিছুক্ষণ বাড়ির ভিতরে থাকার পর নাকি মাথা ঘুরতে থাকে। তাঁরা বেশিক্ষণ এই বাড়ির মধ্যে থাকতে না পেরে বেরিয়ে আসেন। তাতে আর আশ্চর্যের কী! উলটো বাড়িতে সোজা হয়ে ঢুকলে তেমনটা তো হবেই! তবে এখন জার্মানির থ্যাসেনহাইডা শহর সহ, অস্ট্রিয়া, চিন, জাপান, রাশিয়ার কিছু শহরে এমন উলটো বাড়ি তৈরি হয়েছে। মার্কিন দেশের উইসকনসিন প্রদেশের এক শহরে উলটো 'হোয়াইট হাউজ়'ও তৈরি হয়েছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তক্তা মিউজ়িয়ামের দেওয়ালে

খ্যাপাটে বাড়ি

প্রকৃতি আর রূপকথা মিলেমিশে একাকার ভিয়েতনামের এই বাড়িতে। সেদেশের দা লাত শহরে ১৯৯০ সালে তৈরি হয় এক খ্যাপাটে বাড়ি। বাড়ির মালিক দাঙ ভিয়েত না নিজেই তার নকশা করেন। নিজে পেশাদার স্থপতি। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেছিলেন। তাই নিজের ইচ্ছেমতো এক ওলটপালট বাড়ি তৈরি করলেন দাঙ। কাঠ আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি এই বাড়ির নাম 'ক্রেজ়ি হাউজ়'। বাইরে থেকে

ভিয়েতনামের দা লাত শহরের 'ক্রেজ়ি হাউজ়'

দেখলে মনে হবে একটা গাছ ডালপালা মেলেছে। আর তার ডালে-ডালে ছড়িয়ে রয়েছে এই বাড়ির ঘরদোর। বাড়িটিতে খোলা জায়গাই বেশি। কারণ দাঙ মনে করেন যে, প্রকৃতিকে আগে জায়গা করে দিতে হবে। তারপরে নির্মাণ। বাড়ির কোনও জানলা-দরজা চৌকো বা কোনও একধরনের আকারে নয়। তিন-চার-ছয় কোনার নির্দিষ্ট কোনও আকারেরও নয়। ঘরের আকারও তেমন। তেড়াব্যাঁকা। ছাদ সমান নয়। সেখানে গাছের ডাল-বাকল নেমে এসেছে। গোটা বাড়িতে কাঠের ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। গাছের গোটা-গোটা লম্বা গুঁড়ি কেটে সিঁড়ি তৈরি হয়েছে। ক্রেজি হাউজ় কোনও বসত বাড়ি নয়। হোটেল একটা। যার প্রতিটি ঘর এক-একটি পশুকে থিম করে বানানো হয়েছে। পিঁপড়ে, বাঘ, ক্যাঙারু, হরিণ এমন সব। বাঘের ঘরে ঢুকলেই দেখা যাবে সেখানে লাল চোখ পাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি সে। বিছানার দিকে থাবা বাড়িয়ে। যেন বিছানায় কেউ এসে বসলেই হামলে পড়বে সেই বাঘ। এমন ভাবনা বাকি ঘরগুলোতেও রয়েছে। তবে প্রথম দিকে মানুষজন বাড়িটির এমন খ্যাপামি-পাগলামিকে ঠিকমতো মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তা সয়ে গিয়েছে, জনপ্রিয়তাও বেড়েছে বাড়িটির। এখন ভিয়েতনামের অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্র এই ক্রেজ়ি হাউজ়। পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থার তরফে এই বাড়ির নকশা পুরস্কৃত হয়েছে। বছর-বছর প্রায় লক্ষাধিক পর্যটক আসেন শুধু এই বাড়িটি দেখতে।

খ্যাপাটে বাড়ির অন্দরসজ্জা

তবে মজার ব্যাপার হল, এই বাড়ির নির্মাণ কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। নতুন কোনও ভাবনা মাথায় এলেই, সেটাকে বাস্তবে চেহারা দিতে, আবার নির্মাণ কাজে মেতে ওঠেন সত্তরোর্ধ্ব দাঙ ভিয়েত না। সৃষ্টিসুখের নেশা যেন থেমেও থামে না!

নাচ বাড়ি

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় এক স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা লিখে গিয়েছেন। যেখানে বরগা-কড়িতে ঠোকাঠুকি লেগে কলকাতা যেন 'নড়িতে-নড়িতে' চলেছে। কবি স্বপ্নে দেখছেন, গোটা কলকাতা শহরটা দুদ্দাড় করে চলতে শুরু করেছে। ইট-কাঠ-কংক্রিটে তৈরি বাড়িঘরের সেই নৃত্য নেশার কথা সহজ পাঠের দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে। এখন ভাবা যাক, নৃত্যরত একটা বড় বাড়ির চেহারা ঠিক কেমন হতে পারে?

চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগের রাস্তায় ঠিক এমনই এক 'ডান্সিং হাউজ়' তৈরি হয়েছে ১৯৯৬ সালে। গোটা পৃথিবীর বাড়ি তৈরির নকশায় যা এক বিস্ময়!

প্রাগ শহরের রাস্তায় নাচ বাড়ি

১৯৯২ সালে এই বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আসলে প্রাগ শহরের ভোতাভা নদীর ধারে একটা অনেক পুরনো বাড়ি ছিল। যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই বাড়ি ভেঙে ছক ভাঙা একটা কিছু নির্মাণ করতে চাইছিলেন বাড়ির মালিক এবং নকশাকারেরা। সেইমতো কাজ শুরু হল। তবে কাজ শুরু হতেই বিতর্ক তৈরি হল এমন নির্মাণ নিয়ে। শেষকালে তখনকার চেক প্রেসিডেন্টের ইচ্ছেয় এই বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হল। মোট ন'তলা বাড়ির পুরোটাই হোটেল আর রেস্তরাঁ। দুটো তলা মাটির নীচে। মোট ৯৯টি কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি হয়েছিল এই বাড়ি। এর পর চেক মুদ্রাতেও এই বাড়ির আকৃতি ব্যবহার করে সেদেশের জাতীয় ব্যাঙ্ক।

প্রথম দিকে দুই নৃত্য শিল্পীর নামানুসারে বাড়িটির নাম রাখা হয় 'ফ্রেড অ্যান্ড জিঞ্জার'। তবে এখন সেই নাম মুছে গিয়েছে। গোটা বিশ্বের মানুষ প্রাগের এই অদ্ভুত সুন্দর নাচ বাড়িকে 'ড্যান্সিং হাউজ়' নামেই চেনে।

শুধু এই ক'টাই নয়। আজব বাড়ির তালিকা বাড়াতে থাকলে তা আরও লম্বা হয়ে যাবে। যেমন, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি 'বুর্জ খালিফা'র উচ্চতা ২৭১৭ ফুট। মোট ১৬৩ তলার বাড়িতে সিঁড়ি রয়েছে ২৯০৯টি। মধ্য প্রাচ্যের মরুভূমির ফুল 'স্পাইডার লিলি'র গড়ন থেকে এই বাড়ির নকশা তৈরি হয়েছে। আবার ধরা যাক, জাপানের এক কাচের বাড়ির কথা। তিনতলা বাড়ির গোটাটাই কাচ দিয়ে তৈরি। সূর্যের আলো যাতে বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে ঢুকতে পারে, তাই মালিকের এমন বাড়ি তৈরি করা। তেমনই আজব হল পৃথিবীর বোধ হয় সবচেয়ে ছোট বাড়ি। যা রয়েছে পোল্যান্ডে। নাম 'কেরেট হাউজ়'। বাড়িটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ যথাক্রমে ১৫২ সেন্টিমিটার এবং ৯২ সেন্টিমিটার। দুটো বিরাট বহুতলের মাঝে তা দাঁড়িয়ে। বেলজিয়ামে একটি ১০০ ফুট উঁচু পরিত্যক্ত জলের ট্যাঙ্ককে বাড়ি বানিয়ে থাকছেন কিছু লোক। কিংবা ধরা যাক, কাতারের দোহা শহরের 'জ়িগজ়্যাগ টাওয়ার্স'। যে দু'টি বাড়ির প্রতিটি ভাঁজে ৩৪টি করে তলা রয়েছে। ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে এক হোটেল তৈরি হয়েছে বুদবুদের আকারে। সেও এক আজব বাড়ি।

এমন বিস্ময় বাড়ির সংখ্যা দিনে-দিনে আরও বাড়বে। কারণ, বিজ্ঞানে ভরসা রেখে স্থপতিরা তাদের নকশায় আরও নিত্যনতুন চমক আনবেন। তাতে বিশ্ববাসীও আরও এমন সব আজব বাড়ি উপহার পাবে।

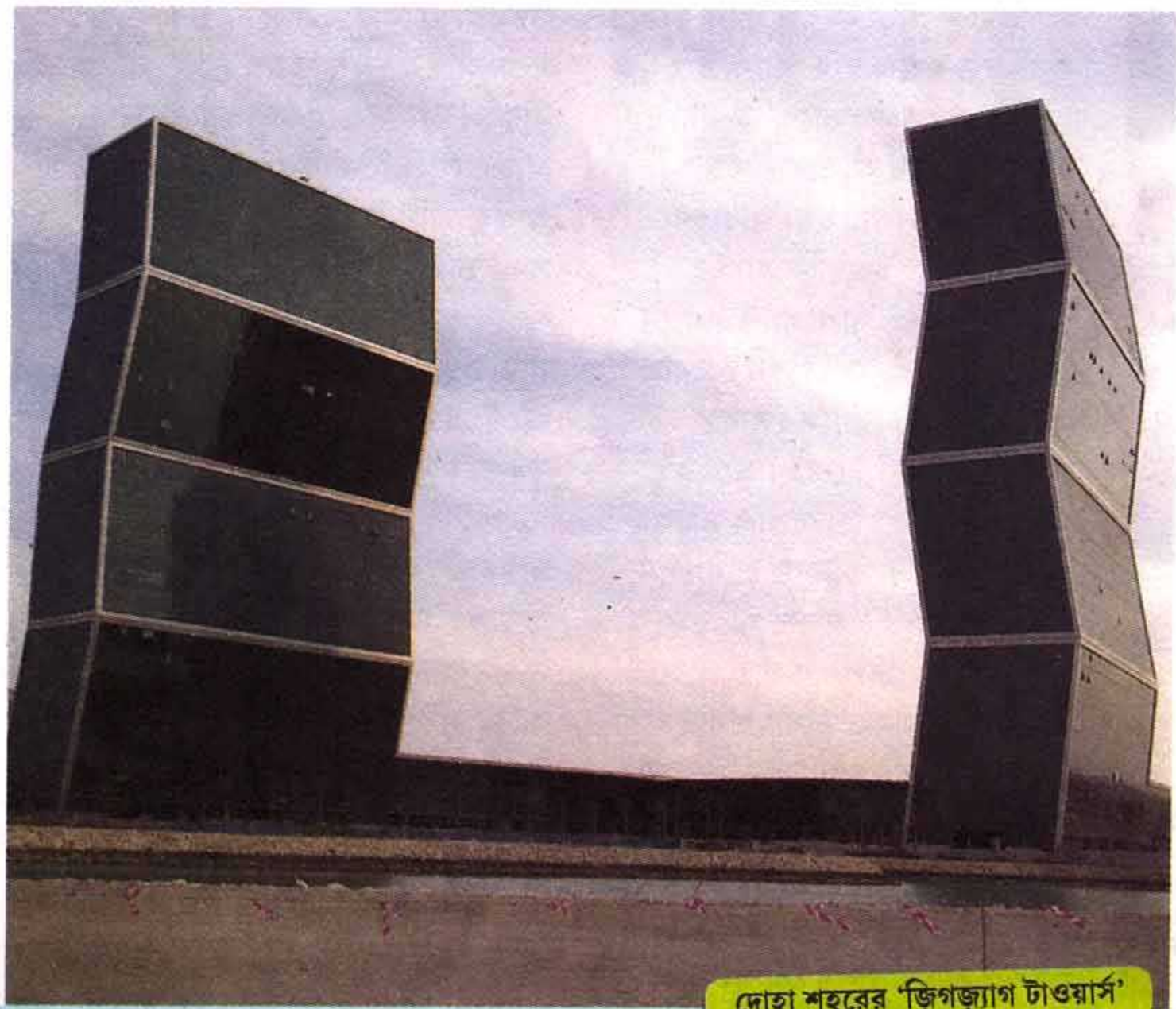

দোহা শহরের 'জ়িগজ়্যাগ টাওয়ার্স'

দুর্গাপুর বিদ্যাসাগর মডেল হাই স্কুল

শুধু লেখাপড়ার উন্নতি এখানে পাখির চোখ নয়, মূল্যবোধও তৈরি করে এই বর্ধমানের স্কুলটি।

গত দশকের মাঝামাঝি সময়ে সিটি সেন্টার অঞ্চলে শহরের অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিল একটি আদর্শ বাংলা মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। স্বপ্ন সাকার হয়ে উঠেছিল অচিরেই। বহু চিন্তাশীল মানুষের স্বপ্নের ফসল হয়ে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল দুর্গাপুর বিদ্যাসাগর মডেল হাই স্কুল। বাংলা রেনেসাঁসের সময় যে মহাপুরুষ বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী হন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদর্শে এই স্কুলকে গড়ে তোলা হয়। তাঁরই পুরনো কিন্তু অজেয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে চান স্কুলের নেপথ্যে থাকা মানুষজন। সাধারণ বাংলামাধ্যম স্কুল বললেই যেমন অনেকের ভুরু কুঁচকে যায় আর অভিভাবকেরা সন্দিহান হন যে বাংলা স্কুলে পড়ে ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ কতটা ভাল হবে, সেটা দূর করতে স্কুলটি গোড়া থেকেই কিন্তু সতর্ক ছিল। বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করেও যাতে ছাত্ররা ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ হতে পারে, ইংরেজি ভাষায় রপ্ত হয় দক্ষভাবে, সেজন্য বিদ্যালয়ে আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সাধারণ ইংরেজি ক্লাসের পাশাপাশি এখানে স্পোকেন ইংরেজি ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুলের প্রিন্সিপাল সুচিন্ত্য চট্টরাজ জানালেন, ‘‘আদর্শ পরিবেশ স্থাপন করতে পারলে কোনও ভাষা শেখাই বাধা নয়।’’ তিনি জানালেন, এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্গাপুর নগর নিগম কর্তৃপক্ষ খুব সাহায্য করেছে। ওদের কাছ থেকে পুরনো বিল্ডিংয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ভবনের পুরো দ্বিতলটি পেয়েছে স্কুলটি। বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের অনুমতিও দিয়েছে ওরা। সেজন্য দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালকে বারবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রিন্সিপাল। ওদের সহযোগিতা ছাড়া এই স্কুল তৈরি হওয়া সম্ভব হত না। ২০০৮ সাল থেকে জুনিয়র হাই স্কুল ও ২০০৯ সাল থেকে উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন পেয়েছে বর্ধমানের এই স্কুলটি। ঠিক এই মুহূর্তে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪২৫। একে তো সদ্যপ্রতিষ্ঠিত স্কুল, এছাড়াও অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিদ্যালয়ের সাফল্যের হার সত্যি চমকে দেয়। মাধ্যমিকে সাফল্য শতকরা ১০০ ভাগ। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় প্রীতম চক্রবর্তী নামে এক ছাত্রের কথা। প্রিন্সিপাল সগর্বে জানালেন, সে শতকরা ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে চরম শারীরিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে। কৃতী ছাত্রের কথা বলার সময় গর্বে ভিজে যাচ্ছিল প্রিন্সিপালের কণ্ঠস্বর। তিনি মনে করেন, শুধু গতানুগতিক লেখাপড়ার মধ্যে আটকে থাকলে মানসিক বিকাশ হয় না, তাই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাণ্ডে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন নিষ্ঠভাবে। সারা ভারত কুইজ় প্রতিযোগিতা, শহরে অনুষ্ঠিত নাচ-গানের অনুষ্ঠানে সারা বছরই তাঁর স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে ও তাদের দক্ষতা মানুষকে মুগ্ধ করে। বহুবার ‘টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায় এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি প্রকাশিত হয়েছে। অন্য দিকে ম্যানচেস্টারে ডিডসবারি রোটারি ক্লাবেও তাদের আঁকা ছবি রয়েছে। ইংল্যান্ডের চিফস্টেন রোটারি ক্লাব ও ডিডসবারি রোটারি ক্লাব স্কুলের গ্রন্থাগার নির্মাণে অনেক সাহায্য করেছে। পাঠাগারের নতুন ভবন উদ্বোধন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

সুচিন্ত্য চট্টরাজ

প্রপৌত্র শ্রী সুপ্রিয় ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী শ্রীমতী শুভ্রা ঠাকুরের উপস্থিতিতে। বিদ্যালয়ে বছরের বিভিন্ন স্মরণীয় দিন যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বৃক্ষরোপণ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণদিবস, শিক্ষকদিবস, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সারা বছর ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহে মেতে থাকে। প্রিন্সিপাল চান, এভাবেই ছাত্রছাত্রীদের শিকড়ের প্রতি নিষ্ঠা জন্মাবে। তবে বিদ্যালয়ের সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো কথা এখনও বলা হয়নি। নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য নিয়মিত জার্মান ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে স্কুলে। এটি সত্যি অভিনব একটি ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত বলতে হয়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অন্তর্গত আর কোনও স্কুলে জার্মান শেখানো হয় না। তবে সার্টিফিকেট এখনও দেওয়া হয় না। সেজন্য ভবিষ্যতে ম্যাক্সমুলার ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যোগস্থাপনের লক্ষ্যও রয়েছে বলে জানালেন প্রিন্সিপাল। জার্মান ভাষার সিলেবাসটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন স্তরের। কিন্তু ছোটদের কথা মাথায় রেখে একটু সহজ করা হয়েছে। এছাড়া শরীর গঠন বা খেলাধুলোও মনোযোগ এড়ায়নি স্কুলকর্তৃপক্ষের। প্রশিক্ষকদের সাহায্যে ছাত্রদের ক্যারাটে শেখানো হয় এখানে। স্কুলে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা প্রায় বারোটি। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া যায়। তবে ভবিষ্যতে উচ্চ মাধ্যমিক করার ইচ্ছে আছে কর্তৃপক্ষের। অবশ্য অভিভাবকদের দাবিও একটা কারণ। ২০১৬ সালের মাধ্যমিকে রেজ়াল্ট খুবই আশাব্যঞ্জক। একশো শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। ফলে স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ২০১৬ সালে ৫২ জন পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশন ২০ জন। তিনজন ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। স্কুলের শৈশবস্থা কাটেনি। তার মধ্যে এমন রেজ়াল্ট যথেষ্ট উদ্দীপনাময়। স্টার পেয়েছে ১৪ জন। সবচেয়ে বেশি নম্বর যে মেয়েটি পেয়েছে, তার নাম অন্বেষা কর্মকার। অনেক দূর থেকে সাইকেল চালিয়ে এসে তারপর বাসে করে এসেও ৯১.৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছে অন্বেষা। ''আমরা মনে করছি এটি যথেষ্ট পজ়িটিভ স্পিরিট বহন করে,'' জানালেন দুর্গাপুর বিদ্যাসাগর মডেল হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল সুচিন্ত্য চট্টরাজ।

আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই স্কুল বর্ধমানের মাটি থেকে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী তুলে আনবে, তারা ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষ হবে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই স্কুলের লক্ষ্য সেটি। যেন শুধু একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ না তৈরি হয়। মানবিক গুণসম্পন্নও হয়। সমাজের উপকারে ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়বে মানুষের প্রয়োজনে। যে গুণগুলো আজ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, ছোটদের ভিতর সেইসব ঘুমিয়ে থাকা অঙ্কুরগুলো বিকাশের

চেষ্টা করা হয় এই স্কুলে। চেষ্টা করা হয় লেখাপড়ায় সাফল্যের পাশাপাশি সমাজ ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধ জাগানোর। এই অন্য রকম লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে বর্ধমানের নবীন এই স্কুলটি মানুষের শুভেচ্ছা নিয়ে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্ধমান মডেল স্কুল

ইংরেজি মাধ্যম হলেও বাংলা ভাষাও যত্ন করে শেখানো হয় এই স্কুলে।

বর্ধমানের ওরিয়েন্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর এডুকেশন ও রিসার্চের একটি শাখা এই স্কুলটি। সম্পাদক অচিন্ত্য মণ্ডল জানালেন, "২০০০ সালে এটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কলেজ হিসেবে শুরু হয়। বর্ধমান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সায়েন্স কলেজের নাম এখন অনেকেই জানেন। তবে প্রথম থেকেই আন্তরিক ইচ্ছে ছিল স্কুল খোলার।" ২০০৩ থেকে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। খোলা মাঠের মধ্যে বিশাল ক্যাম্পাসে আজকের চারতলা ইমারতে গড়ে ওঠা স্কুলটির প্রথম দিনগুলো শুরু হয়েছিল একটি ভাড়াবাড়িতে। অচিন্ত্যবাবু জানালেন, উদ্দেশ্য ছিল যে জিনিস পাইনি সেসময়ে আমাদের জীবনে, আর যে জিনিস ভাল পেয়েছি, সেগুলো মিলিয়েই একটা ভাল স্কুল তৈরি করা। স্কুলটি হয়তো যুগের চাহিদা মেনে ইংরেজি মাধ্যম হবে, কিন্তু মাতৃভাষাকে অবশ্যই প্রাধান্য দেওয়া হবে। মাতৃভাষা খুবই যত্ন করে শেখানো হয় এখানে। ইংরেজি ছাড়াও এখানে হিন্দি ও বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুলে সি বি এস ই বোর্ডের পঠনরীতি মানা হয়। বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্কুলের সিলেবাস। সেজন্যই এখানে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা, ভোকেশনাল শিক্ষার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। স্কুলের প্রিন্সিপালের নাম ডঃ কৌশিক দাস। অচিন্ত্যবাবু জানালেন, "সত্যি যদি কেউ ক্রিকেট খেলতে চায়, তাকে জোর করে ইঞ্জিনিয়ার করার কোনও চেষ্টা করা হয় না এখানে। পুরনো ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে যার যা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সেটাকে রুজি করার উপর, জোর দেওয়া হয়।" ঠিক যে, সব অভিভাবক এরকম চায়, তা অবশ্য নয়। খেলাধুলোতেও এখনকার ছাত্র বা অভিভাবকদের আগ্রহ নেই, সে ব্যাপারে অনুযোগ তো স্পষ্ট তার কণ্ঠে। তবে শুধুই পড়ার বোঝা যাতে ছাত্রদের ঘাড়ে না চেপে বসে, সেজন্য এখানে খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুলে ডে-বোর্ডিং আছে। নাচ-গান-বাজনা-খাওয়ার ব্যবস্থা স্কুলের ভিতরেই হয়। তবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে হয়। কিন্তু যারা ডে-বোর্ডিংয়ে পড়ে না, তাদের হয়তো এতটা মাঠমুখী হওয়ার সুযোগ থাকে না। অচিন্ত্যবাবুর মতে, কিন্তু সেটা তো ঠিক নয়। স্বাস্থ্যকে অবশ্যই ছাত্রাবস্থায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ছোটদের মন অনুসারে আদর্শ ছাত্রজীবন কেমন হওয়া উচিত, সেই পদ্ধতি স্কুলে অনুসরণ করা হয়। সেই কথা স্মরণে রেখেই দেশীয় রীতির উপর জোর দেওয়া হয়। বিদেশে যাওয়ার চেয়ে ভাল মানুষ হওয়ার দিকে ছাত্রদের মন তৈরি করা হয়। স্কুলটিতে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৯৫০জন। এদিকে কিন্ডারগার্টেন ও প্লে স্কুলও রয়েছে। সেসব নিয়ে ১২০০ ছোঁবে। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে স্কুলটিতে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স শাখায় পড়া যায়। ক্লাসরুমের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি। তবে স্কুলটির একটি গর্ব করার জায়গা হল ল্যাবরেটরি। অচিন্ত্যবাবু জানালেন, পশ্চিমবাংলার খুব কম স্কুলে এত বড় আর আধুনিক ল্যাবরেটরি আছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ল্যাবরেটরির কথা তো সকলে শুনেছে। এখানে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিও খোলার চেষ্টা চলছে।

ডঃ কৌশিক দাস

কিছু-কিছু বিষয়ের ল্যাবরেটরি খোলা হয়েও গিয়েছে। শুধু পড়ার বইয়ের অক্ষর থেকে বেরিয়ে এখানে ছাত্রদের কল্পনা আর ধারণা রূপ পায়। যেসব ছাত্রছাত্রী কমার্সের শাখায় পড়ে, তারাও বঞ্চিত হয় না। তাদের নিয়ে স্কুল থেকে ইন্ডাস্ট্রি ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা আছে। গত বছর এখান থেকে মাধ্যমিক দিয়েছিল ৬১ জন ছাত্রছাত্রী। উচ্চ মাধ্যমিকে বসেছিল ১০৪ জন।

স্কুলের ফলাফল বেশ ভাল। গত বছরে সাতজন ছাত্রছাত্রী জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় মেডিক্যালে চান্স পেয়েছে। প্রথম আটশো ছাপান্ন স্থানাধিকারীর মধ্যে চারজন স্থান করেছে মেডিক্যালের নির্বাচনী পরীক্ষায়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম হাজারজনের মধ্যে পাঁচজন এই স্কুল থেকে। সেটা কম কথা নয়। ক্লাস টেনে টেন সি জি পি এ পেয়েছে চারটি ছেলে। তারা হল আয়ুষ ভৎসল, সায়ন্তন হালদার, শুভম বসু, শুভজয় মাহাত। প্রত্যেকেই খুব মেধাবী ও পরিশ্রমী। গত বছরে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৯৩.৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে এই স্কুলেরই ছাত্র। সে গোটা বর্ধমান জেলায় কিন্তু সি বি এস ই পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞানে ৯২ শতাংশের উপর পেয়েছে আরও তিনজন। অন্য দিকে বাণিজ্য শাখায় গড়ে ৭৫ শতাংশ পেয়েছে তিনজন। আর্টসে সর্বোচ্চ উঠেছে ৭০.৪ শতাংশ নম্বর। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বিষয়ের পর্যাপ্ত বই আছে। অচিন্ত্যবাবু জানালেন, সমাজের উন্নতিসাধনই এই স্কুল তথা সংস্থার উদ্দেশ্য। এই বিশেষ সংস্থার অধীনে নার্সারি থেকে পিএইচ ডি-ও করানোরও ব্যবস্থা আছে। স্কুলের পর আন্ডারগ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সও রয়েছে। স্কুলের ছাত্রদের এখানকার সংশ্লিষ্ট কলেজে ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। চারদিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে স্কুলের বেতন ধার্য করা হয়েছে। গরিব ঘর থেকে যারা আসে, তেমন ছাত্রদের কথা তো বিবেচনা করাই হয়। স্কলারশিপের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে অদূর ভবিষ্যতে। খেলাধুলোতেও ছাত্রদের প্রচুর কৃতিত্ব রয়েছে। রয়েছে ড্যাজ়ল নামে একটি দারুণ সুন্দর স্কুলপত্রিকা। এখানে বাংলা ও ইংরেজিতে ছাত্রছাত্রীদের লেখা ও সুন্দর ছবিগুলোতে ফুটে উঠেছে ভবিষ্যতের অনেক তারার আলো।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে অচিন্ত্যবাবু বললেন, স্কুলটিকে উৎকর্ষের শিখরে নিয়ে যাওয়া তাঁদের লক্ষ্য। পরিমাণের চেয়ে গুণগত উদযাপনের দিকে যেতে চান স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেজন্যই পরিকাঠামো যদিও ২৬০০ ছাত্রের

উপযোগী রয়েছে, কিন্তু শৃঙ্খলার কথাটি গুরুত্ব দেওয়া হয় এখানে। প্রত্যেকের প্রতি আলাদা করে নজর দেওয়া হয়। অচিন্ত্যবাবু জানালেন যে, ১৬০০ জনের বেশি ছাত্র কখনওই নেওয়া হবে না স্কুলে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই আদর্শ আর যত্নের জন্যই বর্ধমান জেলা থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে এই স্কুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পাঁচুমিস্তিরির হিসেব

কৌশিক পাল

সদানন্দবাবু পড়েছেন মহা ফাঁপরে! কিছুতেই হিসেবটা মাথায় ঢুকছে না তাঁর। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? গ্রামশুদ্ধ লোক জানে, হিসেবের ব্যাপারে এক্কেবারে পাকা মানুষ সদানন্দ বটব্যাল। বড়-বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ফটাফট মুখে-মুখে করে দেন তিনি, সেই তাঁকেই নাকি ঘোল খাইয়ে ছাড়ল পাঁচুমিস্তিরি! ব্যাটাচ্ছেলের

এত বড় আস্পর্ধা, বলে কিনা, "আজকের দিনটা সময় দিয়ে গেলুম। যা ভাববার এর মধ্যে ভেবে নিন!"

পাঁচুর কথাটা শোনার পর রাগ করবেন কী, উলটে নিজের উপরেই করুণা করতে শুরু করেছেন সদানন্দ। পঁচিশ হাজার টাকা পাঁচজনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করলে এক-একজনের ভাগে যে কোনওভাবেই চোদ্দো হাজার টাকা করে পড়তে পারে না, সেটা তো একটা পাগলেও জানে। আর সদানন্দ যে পাগলেরও অধম নন, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোনও অবকাশই নেই। কিন্তু পাঁচু সেই অদ্ভুতুড়ে হিসেবটাই খাতায় লিখে তাঁকে বেমালুম বুঝিয়ে দিল!

পাঁচুমিস্তিরি নয়নজুলি গ্রামের এলেমদার লোক। বাড়ি মেরামত ও রং করার কাজে তার বিস্তর নাম। শহর থেকে বড়-বড় বরাত আসে পাঁচুর কাছে। লোকলস্কর নিয়ে পাঁচু ফটাফট নামিয়ে দেয় সেইসব কাজ। গ্রামের বহু ছেলেপিলেকে সে নিজের রং করার দলে সামিল করেছে। পাঁচুর সুবাদে এলাকার ছেলেছোকরারাও বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছে ইদানীং। তারা সকলেই পাঁচুদা বলতে অজ্ঞান। ছেলেরা কাজকম্ম পেলে যা হয়, সেইসব ছেলের বাপ-মায়েরও এখন নয়নের মণি ওই পাঁচু মিস্তিরি। সেই পাঁচুকে ঠগ, জোচ্চর বললে নয়নজুলির মানুষ শুনবে কেন? যদিও নিন্দুকে বলে, পাঁচু আসলে সুবিধের লোক নয় মোটেই। কিন্তু সে-তো সদানন্দও নন। তাই তো পাঁচুকে কাজটা দেওয়া আগে অগাধ ভরসা ছিল সদানন্দর নিজের উপর। আর যাকেই টুপি পরাক পাঁচু, তাঁর কাছে অন্তত খাপ খুলতে পারবে না। তাই ছেলের বিয়ে ঠিক হতেই, বাড়ি রং করার দায়িত্বটা পাঁচুকেই দিয়েছিলেন সদানন্দ। সঙ্গে খেলেছিলেন একটা ছোট্ট চাল। পাঁচুর 'কীর্তিকলাপ'-এর কথা মাথায় রেখে শর্ত দিয়েছিলেন, "কাজ শেষ হলে পুরো পয়সা। নো অ্যাডভান্স।"

পাঁচু গদগদ হয়ে বলেছিল, "আপনি হলেন গিয়ে মোদের গ্রামের গণ্যমান্য মানুষ। আপনার কাছে কি আর আমি ও সব চাইতে পারি? সে না হয় পুরো টাকা আপনি কাজ শেষ হলেই দেবেন'খন।"

কথাটা শুনে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন সদানন্দ। এত বড় একটা কাজ, অ্যাডভান্স ছাড়া! এতটা সত্যিই তিনি আশা করেননি। কিন্তু তখনও বুঝতে পারননি, তাঁর অবাক হওয়া এখনও বাকি আছে।

যাবতীয় আশ্চর্য ভাব চেপে রেখে সদানন্দ গলা গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তা পুরো কাজটা সারতে কত নেবে হে?"

পাঁচু মাথা চুলকে বলেছিল, "আপনি হলেন গিয়ে মোদের গ্রামের গণ্যমান্য মানুষ। আপনার কাছে কী আর চাইব! ওই দেবেন না হয় পঁচিশ হাজার..."

'দুই মহলা বাড়ি, পুরোটা রং করতে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা!' মনে-মনে ভিরমি খেয়েছিলেন সদানন্দ। গ্রামের দিকে সব জিনিসেরই দর কম। তাই বলে যে কাজ পঞ্চাশ হাজারের কমে কেউ হাত লাগাবে না, সেই কাজ পাঁচু করে দেবে মাত্র পঁচিশ হাজারে! তা-ও কোনও রকম অ্যাডভান্স ছাড়া! 'ছি ছি, লোকে নির্ঘাত পাঁচুর সাফল্যে জ্বলে-পুড়ে ওর সম্পর্কে এত খারাপ-খারাপ কথা বলে,' নিজের মনে পাঁচুকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন সদানন্দ।

সদানন্দর ঘোর কাটিয়ে পাঁচু বলে উঠেছিল, "বাবু, একটাই কথা, পাঁচজন লোক কাজ করবে। কাজ শেষে আপনি শুধু তাদের হাতে সমান-সমান টাকা ভাগ করে দেবেন। ব্যস।"

"আমি ওদের হাতে টাকা দিতে যাব কেন? তোমাকে টাকা দেব, তুমি ওদের দিয়ে দিয়ো!" অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিলেন সদানন্দ।

"আপনি হলেন গিয়ে মোদের গ্রামের গণ্যমান্য মানুষ। আপনার হাত থেকে নিজের-নিজের পারিশ্রমিক পেলে ওরা ধন্য হয় বাবু," মাথা চুলকে ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে বলেছিল পাঁচু।

"তা বেশ, আমিই না হয় টাকা দেব ওদের," গদগদ হন সদানন্দ।

"জো হুজুর," বলে সেদিন পেন্নাম ঠুকে বিদায় নিয়েছিল পাঁচু মিস্তিরি।

সপ্তাহ পার হয়নি, তার আগেই নিজের কাজ শেষ করে দিয়েছে পাঁচু অ্যান্ড কোম্পানি! কথামতো পাঁচুর পাঁচজন লোকের হাতে পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়ে, মিষ্টি খাওয়ার জন্য আরও তিনশো টাকা দিয়ে সদানন্দ ভেবেছিলেন, পাঁচুর লোকজন আপ্লুত হয়ে পড়বে। কিন্তু এ কী, টাকা গুনে দেখে এ তো রীতিমতো তুলকালাম শুরু করল পাঁচুর লোকজন। সদানন্দর মাথাতেই ঢুকছিল না, এই গোলমালের কারণ কী! সদানন্দ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এসে হাজির হয় পাঁচু। তারপর পেশ করে তার অদ্ভুতুড়ে হিসেব। যার ভিত্তিতে পাঁচুর পাঁচজন লোকের প্রত্যেকের পাওয়ার কথা চোদ্দো হাজার টাকা করে! সেই হিসেব দেখে সদানন্দর মাথা তালগোল পাকিয়ে ওঠার পরই পাঁচুর অমোঘ ঘোষণা, "আজকের দিনটা সময় দিয়ে গেলুম। যা ভাবাবার এর মধ্যে ভেবে নিন!"

কোনও রকমে নাকে-মুখে চারটি গুঁজে সদানন্দ ছুটলেন বংশীমাস্টারের কাছে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বংশী ধর প্রধান অঙ্ক শেখান। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানে তাঁর চেয়ে ভাল লোক আর হতে পারে না। কিন্তু সমস্যাটা হল, পাঁচু কীভাবে হিসেবটা কষে দেখিয়েছিল সদানন্দকে, সেটা তিনি আর কিছুতেই মনে করতে পারলেন না বংশী মাস্টারের সামনে গিয়ে! সত্যি বলতে কী, পাঁচুর হিসেব দেখে সদানন্দ এতটাই ভেবলে গিয়েছেন, এই মুহূর্তে যে নিজের বাবা-ঠাকুরদাদার নাম মনে করতে পারছেন, এই যথেষ্ট।

সদানন্দর মুখে সব কথা শুনে বংশী প্রধান বললেন, "আপনি ঠিক বলছেন, পাঁচু অঙ্ক কষে আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছে?"

"তা না হলে আর বলছি কী মশাই! কী সাংঘাতিক ধড়িবাজ ভাবুন, গুণ, ভাগ, যোগ... সব রকম ভাবে কষেই ব্যাটাচ্ছেলে দেখিয়ে দিল ওর পাঁচজন লোক প্রত্যেকে চোদ্দো হাজার করেই পাবে!"

"গুণ, ভাগ, যোগ সবই করল! তারপরেও পঁচিশ হাজারের পাঁচ ভাগ

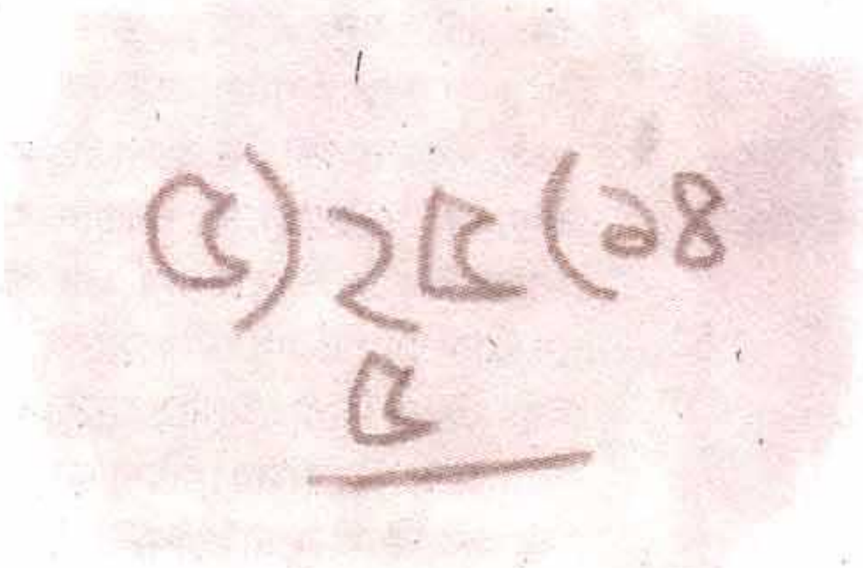

করে ফল দাঁড়াল চোদ্দো হাজার! এ তো অসম্ভব মশাই। বাবার জন্মে কোনওদিন এমন হিসেবে শুনিনি,'' আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন বংশী প্রধান। তারপর একটু থেমে বললেন, '' সেই কাগজটা কই, দেখি তো একবার। যেখানে হিসেবটা কষেছিল পাঁচু।''

''কাগজ তো নেই।''

''নেই মানে!''

''মানে, হিসেবটা তো পাঁচু কষেছিল মাটিতে, কাঠি দিয়ে। আর হিসেব কষেই মুছে দিচ্ছিল সেগুলো,'' বিষণ্ণ মুখে বললেন সদানন্দ বটব্যাল।

''হুম, গন্ডগোল তো একটা আছেই,'' থুতনিতে হাত বুলিয়ে বললেন বংশী প্রধান। তারপর একটু ভেবে বললেন, ''পাঁচু কাল সকালে কখন আসবে বললেন, এগারোটায়। তাই তো? বেশ, আমি নিজে তখন হাজির থাকব আপনার বাড়িতে। দেখি শয়তানটা কী করে আমাকে বোকা বানায়!''

পরের দিন সকালে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সদানন্দ বটব্যালের বাড়িতে হাজির হল পাঁচুমিস্তিরি। সঙ্গে তার পাঁচ-পাঁচটি চ্যালা। এসেই গলা চড়াল, ''কী সদানন্দবাবু, বংশী প্রধান কি এসে গিয়েছেন? তা হলে আর দেরি কেন? এবার বেরিয়ে আসুন...''

সদর দরজার পরদার আড়াল থেকে ফিসফিস করে সদানন্দ বংশী প্রধানকে বললেন, ''দেখেছেন কী শয়তান! আমি যে আপনার কাছে গিয়েছিলাম এবং আপনি যে আজ আমার এখানে আসবেন, সে সব খবর কেমন দিব্যি জোগাড় করে ফেলেছে! আর আজ কী রোয়াব! বায়না নেওয়ার দিন কত বিনয়, ধানাইপানাই... আজ যেন এসেছে কোন তিস মার খাঁ! পাজি, জোচ্চোর, হাড় বদমাইশ কোথাকার...''

বংশীমাস্টার আশ্বাস দিয়ে বললেন, ''ও সব ভেবে আর কী হবে বলুন। অতি ভক্তি সর্বদা চোরেরই লক্ষণ। চলুন, কথা বলেই দেখি।''

বংশীমাস্টারের পিছু-পিছু দালানে এসে দাঁড়ালেন সদানন্দ বটব্যাল। পাঁচুমিস্তিরি একটা চেয়ারে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে। বংশী প্রধানকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''পেন্নাম হই মাস্টারমশাই,'' তারপর সদানন্দর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বাঁকা হাসি ঠোঁটের কোণে খেলিয়ে বলল, ''নিন, এই বেলা সব হিসেব-নিকেশ দেখে নিয়ে আমাকে বিদায় করুন তো। শহরে মেলা কাজ পড়ে আছে।''

বংশীমাস্টার গলা খাঁকরানি দিয়ে বলল, ''এ তুমি কী শুরু করেছ বলো তো পাঁচু? সদানন্দবাবু সম্ভ্রান্ত মানুষ। তাঁকে তুমি এভাবে উত্যক্ত করছ! এটা কি ঠিক করছ?''

''কী বলছেন মাস্টারমশাই? এত বড় কাজ, একটা পয়সা অ্যাডভান্স ছাড়া নামিয়ে দিলাম। আর এখন কাজ শেষে হকের পয়সা চাইলে উনি বলবেন

> ''বেশ। তুমি যদি আমাকে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিতে পার পঁচিশ হাজার টাকা পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে চোদ্দো হাজার টাকা করে পাবে, তা হলে আমি কথা দিলাম, পুরো টাকা তুমি আজই পেয়ে যাবে,'' সদানন্দের দিকে তাকিয়ে আশ্বাস অর্জন করে জোর গলায় বললেন বংশীমাস্টার।

আমি ঝামেলা করেছি!'' ঘাড়ের উপর ফেলা রুমালটাকে দু'বার এপাশ-ওপাশ টানাটানি করে বলল পাঁচু।

''আহা, হকের টাকা দিতে তো উনি অস্বীকার করছেন না। পঁচিশ হাজার টাকায় রফা হয়েছিল, সদানন্দবাবু পঁচিশ হাজার টাকা তোমার হাতে দিচ্ছেন, তুমি নিয়ে চলে যাও। ব্যস!'' পাঁচুকে বোঝানোর চেষ্টা করেন বংশী প্রধান।

''মাস্টারমশাই, আমি তো ওঁকে শুরুতেই বলেছিলাম, আমার পাঁচজন লোকের হাতে টাকাটা সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। ওরা সকলেই তো এই গ্রামেরই ছেলেপুলে। তা এখন যদি উনি সেই কথা অস্বীকার করেন, তা হলে তো আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে,'' গলা চড়ায় পাঁচু।

''কিন্তু তুমি তো প্রত্যেককে চোদ্দো হাজার টাকা করে দিতে বলছ! আসলে তো ওরা পায় পাঁচ হাজার করে!''

''সেটা আপনার হিসেবে মাস্টারমশাই। আমার হিসেবে চোদ্দো করেই পাবে,'' অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে পাঁচু।

''বেশ, তা হলে তো আমাকেও দেখতে হচ্ছে কেমন হিসেব তোমার!'' জেদ চেপে যায় বংশীমাস্টারের।

ঠোঁটের কোণে আরও একবার বাঁকা হাসি খেলিয়ে পাঁচু বলে, ''সে তো আপনাকে দেখাবই মাস্টারমশাই। তবে তারপরে আমি কিন্তু আর কোনও কথা শুনব না। টাকা আমি আজই নিয়ে যাব।''

''বেশ। তুমি যদি আমাকে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিতে পার পঁচিশ হাজার টাকা পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে চোদ্দো হাজার টাকা করে পাবে, তা হলে আমি কথা দিলাম, পুরো টাকা তুমি আজই পেয়ে যাবে,'' সদানন্দের দিকে তাকিয়ে আশ্বাস অর্জন করে জোর গলায় বললেন বংশীমাস্টার, ''আর যদি সেটা করতে না পার, তা হলে কিন্তু একটি পয়সাও পাবে না। কি রাজি?''

''রাজি,'' তালি মেরে বলল পাঁচু।

মাটি থেকে একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে সে বলল, ''প্রথমে কীভাবে বোঝাব? যোগ, গুণ, নাকি ভাগ করে? তবে হ্যাঁ, প্রত্যেক উপায়ে আমি কিন্তু একবার করেই আঁক কষব। তারপর আর কোনও কথা নয়, হ্যাঁ।''

পাঁচুর কনফিডেন্স দেখে একটু আশ্চর্যই হলেন বংশীমাস্টার। গলাটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে বললেন, ''সবচেয়ে সহজ উপায়, ভাগ করেই দেখাও প্রথমে।''

পাঁচু বিদ্যুতের বেগে মাটিতে লিখতে-লিখতে বলল, ''ব্যাপারটা সহজ করার জন্য শূন্যগুলো বাদ দিলাম। মানে দাঁড়াল পঁচিশ। এবার পঁচিশ কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ এক্কে পাঁচ। এক বসল ভাগফলের ঘরে আর পাঁচ বসল পঁচিশের নীচে। বিয়োগ করলে থাকে কুড়ি, এবার নামতা হল পাঁচ চারে কুড়ি। সেই চার বসল একের পাশে, আর নীচে কাটাকুটি। তার মানে ভাগফল চোদ্দো। সিম্পল।''

হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল পাঁচুর চ্যালা-চামুন্ডারা।

পাঁচু এত তাড়াতাড়ি পুরো ব্যাপারটা করে দেখাল যে, হকচকিয়ে গেলেন বংশী মাস্টার। ফ্যালফ্যাল করে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন পাঁচু যা কষেছে, তা মোটামুটি এরকম...

৫)২৫(১৪
৫
———
২০
২০
———
X

বংশী প্রধান বিশেষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাঁচু মাটিতে হাত বুলিয়ে মুছে দিল তার কষা অঙ্ক। তারপর বংশীমাস্টারের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলল, "এবার বলুন মাস্টারমশাই, যোগ করব, নাকি গুণ?"

ভাগটাই হজম হয়নি বংশীমাস্টারের। তবু কোনও রকমে ঢোক গিলে ধরা গলায় বললেন, "গুণ করেই দেখাও বাছা।"

এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি সদানন্দ। কিন্তু বংশীমাস্টারের গোলগোল চোখ দেখে যথেষ্ট ঘাবড়ে গেলেন তিনি। পাঁচু এর পর যোগ আর গুণটাও করে ফেললে নগদ সত্তর হাজার টাকা যে বেরিয়ে যাবে তাঁর পকেট থেকে! মানে পুরো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার চুনা। পেটের ভিতরটা কেমন গুড়গুড় করতে লাগল সদানন্দ বটব্যালের। মিনমিনে গলায় বললেন, "কিছু বুঝলেন মাস্টারমশাই?"

বংশীমাস্টার পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর মাথা নাড়তে-নাড়তে বলতে লাগলেন, "এটা হতে পারে না, এটা হতে পারে না।"

পাঁচু ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছে গুণের প্রস্তুতি। মাটিতে চোদ্দো লিখে তার নীচে একটা পাঁচ লিখে ফেলল ফটাফট। তারপর পাঁচের বাম দিকে একটা গুণ চিহ্ন বসিয়ে বলল, "দেখে নিন মাস্টারমশাই, হিসেব ঠিকমতো করছি কিনা! পরে আবার আমাকে দোষ দেবেন না যেন..."

বংশীমাস্টার বারদু'য়েক অনুলোম-বিলোম সেরে নিলেন। পাছে কনসেনট্রেশনে কোনও ব্যাঘাত ঘটে। মগজে ঠিক মতো অক্সিজেন সাপ্লাই না হলে অনেক সময় দু'চোখ যা দেখছে আর মাথা যা বুঝছে, তার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁকটা মেটানোর জন্য আরও দু'বার লম্বা শ্বাস নিয়ে বললেন, "দেখি তোমার গুণ!"

পাঁচু পাঁচের তলায় একটা লম্বা দাগ টেনে আবার ঝড়ের বেগে বলতে শুরু করল, "পাঁচ চারে কুড়ি। এই লিখলাম কুড়ি। তারপর পাঁচ এক্কে পাঁচ। সেই পাঁচ বসালাম কুড়ির নীচে। কুড়ি যোগ পাঁচ, হয়ে গেল পঁচিশ। সিম্পল!"

"গুরু, গুরু..." বলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল পাঁচুর ছেলেপুলেরা।

বংশীমাস্টার প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, পাঁচু লিখেছে...

১৪
x ৫
———
২০
+৫
———
২৫

তিনি কিছু বলে ওঠার আগে, ঠিক আগের কায়দায় পাঁচু মাটির উপর হাত বুলিয়ে মুছে দিল সব আঁকিবুকি। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, "তা হলে মাস্টারমশাই, এবার পড়ে রইল শুধু যোগ করে দেখানো, তাই তো?"

বংশী প্রধান কিছু বলবেন কী, মাথাটা তাঁর পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে! এরকম অদ্ভুতুড়ে হিসেব যে কোনও ভাবে সম্ভব, তা কখনও দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেননি। কিন্তু গোলমাল তো একটা আছেই। হয়তো সেটা ধরতেও পেরেছেন। কিন্তু পাঁচু এত দ্রুততার সঙ্গে সব বলে যাচ্ছে এবং মুছে ফেলছে, যে খেই পাচ্ছেন না তিনি।

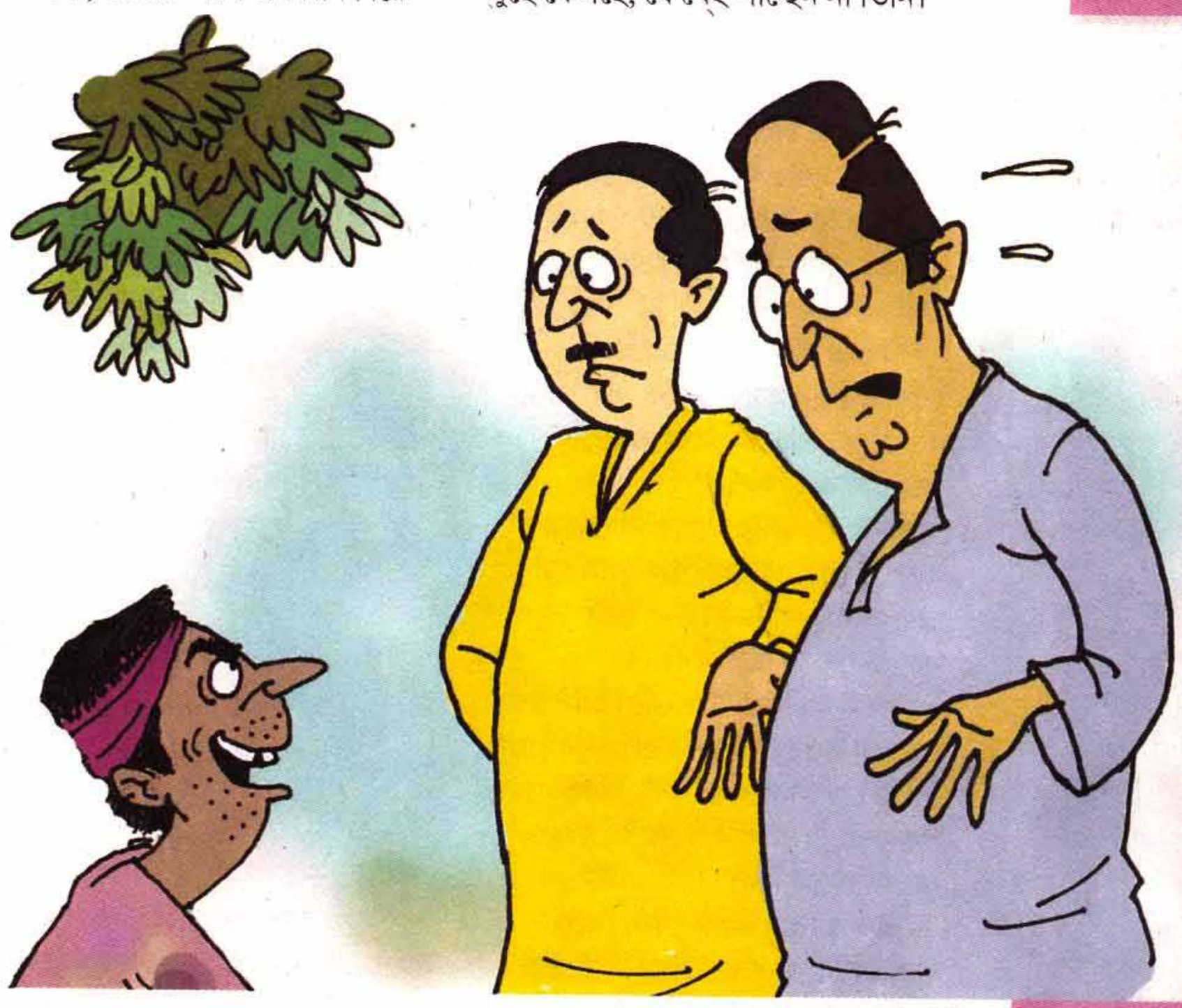

হাতে আছে আর মাত্র একটাই সুযোগ। এবার ব্যাটার কারিকুরি ধরতে না পারলে সর্বনাশ। এই খবর রটে গেলে, তাঁর আর এই গ্রামের স্কুলে পড়ানো চলবে না। অতএব, আরও গভীরভাবে বারকয়েক শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করলেন তিনি।

পাঁচু এবার যোগ করে হিসেব মেলানোর জন্য প্রস্তুত। কাঠি দিয়ে মাটিতে একবার চোদ্দ লিখল সে। তারপর সেই চোদ্দর নীচে-নীচে আরও চারবার চোদ্দ লিখে ফেলল। শেষ চোদ্দোটি লিখে, তার তলায় দাগ টেনে দিয়ে বলল, "নিন মাস্টারমশাই, ভাল করে দেখে নিন।"

সদানন্দ এবং বংশীমাস্টার চোখ গোলগোল করে দেখলেন পাঁচু একদম নীচে লেখা চোদ্দোটির চারের গায়ে কাঠি ঠেকিয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে, আর মুখে বলছে, "চার চারে আট, আট চারে বারো, বারো চারে ষোল, ষোলো চারে কুড়ি..." এই কুড়ি পর্যন্ত বলার পরেই হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে দিল সে, তারপর ঠিক উলটো পথে কাঠির ডগা উপরের চোদ্দোর একের গায়ে ছুঁয়ে রকেট বেগে নেমে আসতে লাগল পরের পর এক গুলির গা বেয়ে, মুখে বলতে লাগল, "কুড়ি একে একুশ, একুশ একে বাইশ, বাইশ একে তেইশ, তেইশ একে চব্বিশ আর এই হল গিয়ে চব্বিশ একে পঁচিশ, ব্যাস! কী, এবার শান্তি হয়েছে তো। দিন এবার আমার টাকা," বলেই এক মুখ বিজয়ীর হাসি নিয়ে ঘাড় তুলে তাকল বংশীমাস্টারের দিকে।

কিন্তু এ কী! বংশীমাস্টারও তো দেখি হাসছেন মুচকি-মুচকি! তার মানে কী, যোগটা করতে গিয়েই গুবলেট করে ফেলেছে সে? তবু স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিশ্বাসে এতটুকু টোল না ফেলে পাঁচু বলল, "কী মাস্টারমশাই, বিশ্বাস হল তো, আমার পাঁচজন লোক প্রত্যেকে পাঁচ নয়, চোদ্দো করেই পাবে?"

সদানন্দর কাঁধে হাত রেখে হাসি চওড়া করলেন বংশীমাস্টার। তারপর খুব ধীরে কেটে-কেটে বললেন, "পাঁচু ঠিকই বলেছে সদানন্দবাবু। আপনি ওদের প্রত্যেককে চোদ্দো করেই দিন।"

এক ঝটকায় নিজের কাঁধ থেকে বংশীমাস্টারের হাত সরিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলেন সদানন্দ, "কী বলছেন বংশীবাবু, চোদ্দো করে পাবে মানে?"

সদানন্দর অবস্থা দেখে মনে-মনে বেশ মজা পেল পাঁচুমিস্তিরি। তবু মুখটা দুঃখ-দুঃখ করে বলল, "কী আর করবেন বলুন! আপনি হলেন গিয়ে এই গাঁয়ের গণ্যমান্য মানুষ। কথা তো আপনাকে রাখতেই হবে। না হলে লোকে কী বলবে!"

সদানন্দর মনে হল, ঠাটিয়ে একটা চড় কষাবেন পাঁচুর গালে। কিন্তু এখন তাঁর যতটা না রাগ হচ্ছে পাঁচুর উপর, তার চেয়ে ঢের বেশি হচ্ছে বংশী প্রধানের উপর। কেমন সুন্দর দাঁত বের করে বলে দিলেন, 'পাঁচু ঠিকই বলেছে সদানন্দবাবু। আপনি ওদের প্রত্যেককে চোদ্দো করেই দিন!' এই বুদ্ধি নিয়ে ছাত্রদের অঙ্ক শেখায়?

সদানন্দর মনের কথা দিব্যি টের পেলেন বংশী প্রধান। একটা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "সদানন্দবাবু, চোদ্দো হাজার নয়, আপনি ওদের দেবেন চোদ্দো টাকা করে। ওরা ওটাই পাবে।"

"চোদ্দো টাকা করে পাবে মানে? ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি!" লাফিয়ে উঠল পাঁচু গোপাল।

"বাবা পাঁচু, ইয়ার্কিটা তো তুমিই শুরু করেছে," যতটা সম্ভব ঠান্ডা গলায় জবাব দিলেন বংশীমাস্টার।

বংশী প্রধানের কথা শুনে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছেন সদানন্দ বটব্যাল। তিনি গদগদ চোখে তাকিয়ে রইলেন

কিন্তু এ কী! বংশীমাস্টারও তো দেখি হাসছেন মুচকি-মুচকি! তার মানে কী, যোগটা করতে গিয়েই গুবলেট করে ফেলেছে সে? তবু স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিশ্বাসে এতটুকু টোল না ফেলে পাঁচু বলল, "কী মাস্টারমশাই, বিশ্বাস হল তো, আমার পাঁচজন লোক প্রত্যেকে পাঁচ নয়, চোদ্দো করেই পাবে?"

বংশীমাস্টারের মুখের দিকে। যেন বংশী প্রধানের মুখ নিঃসৃত বাণী এই মুহূর্তে অমৃত সমান!

পাঁচুকে কোনও কথা বলতে না দিয়ে বংশী প্রধান বলতে লাগলেন, "প্রথমত অঙ্কের যাবতীয় নিয়ম কানুন, এককের ঘর, দশকের ঘর সব উচ্ছন্নে পাঠিয়ে দিয়েছ তুমি। দ্বিতীয়ত..."

"ও সব একক-দশক বুঝি না। আমার হিসেবে কি কোনও খামতি আছে নাকি!" বংশী প্রধানের কথা কেড়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠল পাঁচু।

ততোধিক শান্ত গলায় বংশী প্রধান জবাব দিলেন, "তা খুব ভাল কথা। একক-দশক, অঙ্কের নিয়ম কানুন না বোঝাই ভাল। তা তুমি বাবা হিসেবটা শুরু করেছিলে যেন কত দিয়ে? পঁচিশ দিয়ে, পঁচিশ হাজার দিয়ে তো নয়, তাই না? আর সেই হিসেবে তো তোমার লোকেরা চোদ্দো টাকা করেই পায়, চোদ্দো হাজার করে নয়!"

পাঁচু বুঝতে পারল, এবার সে নিজের জালে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু কথায় ভাঙল না মোটে, "সে তো হিসেবের সুবিধের জন্য করেছিলাম। হিসেব শেষে শূন্যগুলো যথাস্থানে বসিয়ে নিলেই হয়!"

"তুমি যখন কষ্ট করে একবার সেগুলোকে বাদই দিয়েছ, তখন আর ওগুলো ফিরিয়ে এনে লাভ কী বলো!"

"লাভ কী মানে? ওগুলোর কোনও দাম নেই নাকি?"

"দাম যখন আছে, তখন আর ওগুলোকে বাদ দিলে কেন বাপু? তা বেশ। তোমাকে আর-একটা সুযোগ দিচ্ছি। শূন্যগুলোর দাম আছে, এটা যখন বুঝেছ, তা হলে ওগুলোকে সঙ্গে নিয়ে একবার হিসেবটা কষে দেখাও তো চাঁদ। যে-কোনও একটা উপায়ে। গুণ বা যোগ কিংবা ভাগ করে..." আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন বংশী প্রধান।

পাঁচু বুঝতে পেরেছে, কাঁটা এবার গলায় আটকে গিয়েছে। বাঁচার আর কোনও পথ খোলা নেই। তাই সে সোজা ডাইভ দিয়ে পড়ল বংশীমাস্টারের পায়ে। "মাস্টারমশাই, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। এবারের মতো মাপ করে দিন।"

বংশীমাস্টার পাঁচুর দুই কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে তুলে ধরলেন। তারপর বললেন, "আহা! দেখো দেখি। এর মধ্যে মাপ করার কথা কোথা থেকে আসছে! তোমার হিসেব অনুসারে যা প্রাপ্য, সদানন্দবাবু তোমার লোকজনকে সেই টাকাই দেবেন। নিন সদানন্দবাবু, ওদের চোদ্দো টাকা করে দিয়ে বিদায় দিন।"

এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল পাঁচুগোপাল মিস্তিরি। পোঁ ধরল তার সাঙ্গপাঙ্গরাও।

সব দেখেশুনে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে সদানন্দ বটব্যাল বললেন, "আমি হলাম গিয়ে এই গাঁয়ের গণ্যমান্য মানুষ। কথা তো আমাকে রাখতেই হবে। না হলে লোকে কী বলবে পাঁচুগোপাল?"

ছবি: রৌদ্র মিত্র

allmagazine.in

দীপসুন্দর দিন্দা

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন 'দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স'-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা আমরা সবাই জানি। বাংলা ভাষার প্রসার থেকে নানা ধরনের সমাজ সংস্কার করার জন্য তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। তাঁকে দয়ার সাগরও বলা হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পদবি কী ছিল তোমরা জান?

2 ই-মেল কথাটির পুরো নামটা কী?

3 ভারতে এক বৈচিত্রের দেশ। এ দেশের নানা প্রান্তে নানা ধরনের নাচ-গান রয়েছে। বলতে পারবে, ভাংরা নাচটি ভারতের কোন রাজ্যের নৃত্য?

4 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসটি তোমরা প্রায় সবাই নিশ্চয়ই পড়েছ। এই উপন্যাস নিয়ে সিনেমা, কমিক্স সবই হয়েছে। বলতে পারবে উপন্যাসটি কার লেখা?

5 ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধীর স্মৃতিতে উস্তাদ আমজ়াদ আলি খান একটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই রাগটির নাম কী?

6 বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক দিবসী ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান একই। কত রান তুলেছেন তিনজন?

7 ভারতের কোথায় রয়েছে বিনায়ক দামোদর সাভারকর বিমানবন্দরটি?

8 কলকাতায় বসে মশা নিয়ে গবেষণা করে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনিই বের করেছিলেন ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। অনেকে মজা করে তাঁকে বলতেন, মশাবাবু। কিন্তু আসলে কী নাম ছিল এই মানুষটির?

9 বিশ্বের তৃতীয় এবং এশিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তম বইমেলা কোনটি?

10 স্বামী বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি অহিংসর বাণীপ্রচার করেছেন। রাজার ছেলে হয়েও দুঃখের শেষ দেখতে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। রাজপুত্র থাকার সময় তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। বলতে পারবে এই মহামানবকে আমরা কী নামে চিনি?

৫ মে সংখ্যার উত্তর

১) মুম্বই।
২) ইন্দিরা গাঁধী।
৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৪) দাঁতের মাড়ি।
৫) সুভাষচন্দ্র বসু।
৬) পোর্ট ব্লেয়ার।
৭) ডাল লেক।
৮) জগদীশচন্দ্র বসু।
৯) অর্জুনের রথ।
১০) টেবিল টেনিস।

সঠিক উত্তরদাতা

রায়া চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় শ্রেণি, হোলি চাইল্ড স্কুল, জলপাইগুড়ি।

মহার্ণব দে
পঞ্চম শ্রেণি, তন্তুবায় সংঘ হাই স্কুল, শান্তিপুর নদিয়া।

সম্যক দাস
চতুর্থ শ্রেণি, নব নালন্দা, বীরভূম।

রূপকথা মাহাত
সপ্তম শ্রেণি, ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল, ঝাড়গ্রাম।

অনন্যা বেরা
চতুর্থ শ্রেণি, কাঁথি চন্দ্রামণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর।

শরণ্যা দাস
ষষ্ঠ শ্রেণি, শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী।

সৌমিলী মিত্র রায়
সপ্তম শ্রেণি, সাখাওয়াত স্মৃতি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা।

উত্তর পাঠাও ২৮ জুনের মধ্যে। আমাদের ঠিকানা 'আনন্দমেলা আমার কুইজ়' বিভাগ।
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।

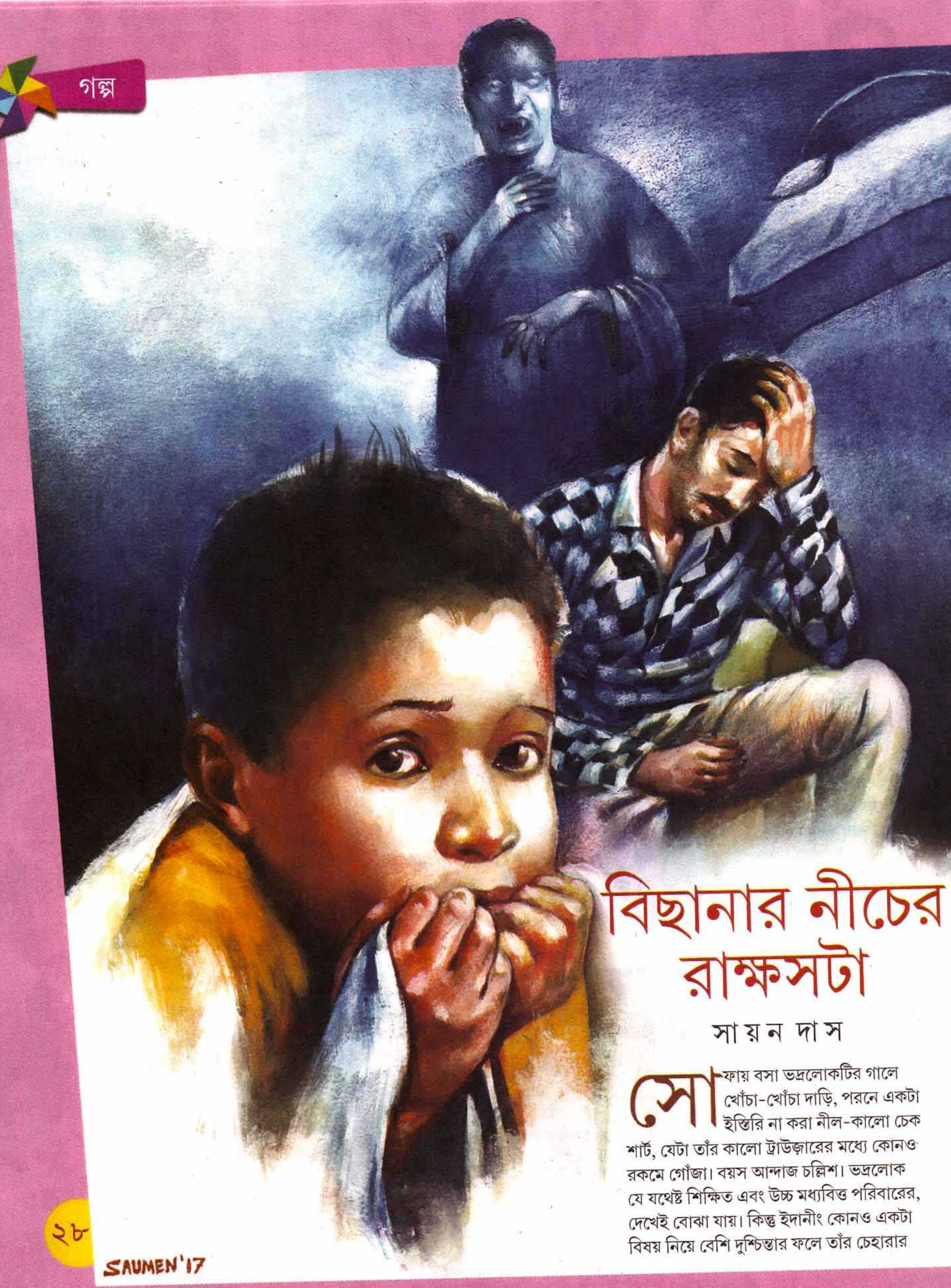

বিছানার নীচের রাক্ষসটা

সায়ন দাস

সোফায় বসা ভদ্রলোকটির গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে একটা ইস্তিরি না করা নীল-কালো চেক শার্ট, যেটা তাঁর কালো ট্রাউজ়ারের মধ্যে কোনও রকমে গোঁজা। বয়স আন্দাজ চল্লিশ। ভদ্রলোক যে যথেষ্ট শিক্ষিত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের, দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু ইদানীং কোনও একটা বিষয় নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তার ফলে তাঁর চেহারার

এই হাল।

দরজা খুলতেই ভদ্রলোক এমন হাঁউমাউ করে উঠলেন যে, তাঁর কোনও কথাই আমি বুঝতে পারলাম না। তারপরে শুরু হল কান্না। কোনও রকমে তাঁকে শান্ত করে আমি সোফায় বসাই। তারপর ভাল করে বুঝিয়ে বলি যে, আমায় পরিষ্কার করে তাঁর আসার কারণ না বললে আমি কোনওভাবেই সাহায্য করতে পারব না। তবেই উনি সোফায় বসেছেন। কিন্তু উনি যে কোনও বিষয় নিয়ে মর্মাহত, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। প্রথমেই তাঁর নামটা জেনে নিলাম।

"তা হলে বলুন দীনেশবাবু," তাঁকে এক গ্লাস জল দিয়ে সামনের সোফাটায় বসে বললাম, "সব কিছু প্রথম থেকে খুলে বলুন।"

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুরু করলেন, "আমার ছেলে মণির (ভাল নাম মনীশ) বয়স মাত্র পাঁচ। ওইটুকু ছেলে যে ভূতে ভয় পাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে বলুন! সে ভূতের ভয়ে যেসব উদ্ভট গালগল্প বলছে, সেগুলোকেও গুরুত্ব দিই কী করে?"

"ঠিক কী রকম গালগল্প বলছে আপনার ছেলে?" জানতে চাইলাম।

"ওই যেমন রাত্তিরে কেউ নাকি ওর বিছানা খুব ঝাঁকাচ্ছে। বড়-বড় ছায়া দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে, এইসব আর কী! প্রথমে ভাবলাম ওর মায়ের অভাবের জন্যই হয়তো..."

"আপনার স্ত্রী ঠিক কবে মারা যান?"

"তা প্রায় তিন মাস হয়ে গেল।"

"ওঁর মৃত্যুর কারণ অ্যাক্সিডেন্ট কি?"

"না, না। ক্যানসার। একেবারে লাস্ট স্টেজে ধরা পড়ে। কিছুই করার ছিল না," বলে দীনেশবাবু মেঝের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ছলছলে।

ওঁর মন অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললাম, "বেশ, এবার আপনার ছেলের কথা বলুন।"

উনি শুরু করলেন, "ওর বয়সি আর পাঁচটা ছেলের মতোই আমার ছেলে মণি স্কুল যায়, লেখাপড়া করে, পার্কে যেতে ভালবাসে, ভিডিয়ো গেমস পছন্দ। কিন্তু ওর মায়ের মৃত্যুর পর বড় চুপচাপ হয়ে যায়।"

"সেটা কি স্বাভাবিক নয়?" বললাম আমি।

"নিশ্চয়ই! প্রথম দিকে সব ঠিকই ছিল। তারপর আস্তে-আস্তে ও আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায়। স্কুলে যেতে শুরু করে, লেখাপড়া, খেলাধুলো ইত্যাদি। কিন্তু আবার কিছুদিন পর হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়। এর মধ্যে হয়েছে কী, দু'মাস আগে আমি নতুন একটা বাড়ি দেখে সেখানে চলে আসি ওকে নিয়ে। এই নতুন বাড়িতে ওঠার পর যেন আরও চুপচাপ হয়ে যেতে থাকে ও। স্কুলে যেতে চায় না, খেলতে যেতে চায় না, ভূতের ভয়ে জড়সড়। ভাবুন একবার!"

"আপনি তখন কী করলেন?"

"বিশ্বাস করুন, আমি যথেষ্ট ধৈর্য ধরেছি। ওইটুকু ছেলে, গায়ে হাত তোলা তো দূরে থাক, বকাঝকাও করিনি কখনও। ওর সঙ্গে আরও বেশি করে সময় কাটাবার চেষ্টা করছি। ওর মনের কথা জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু সবই যেন বিফলে গেল। ও আর আগের মতো হল না। আর তারপর শুরু হল মাঝরাতে যত ঝামেলা।"

"কী ধরনের ঝামেলা?"

"ওই যে, কেউ নাকি ওর বিছানা ধরে ঝাঁকাচ্ছে, ঘরের মধ্যে লম্বা-লম্বা ছায়া দেখা যাচ্ছে। রাত্তিরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে লাগল। ওর ঘরে গিয়ে দেখি, ভয়ে কাঁপছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে সেই এক ভূতের গল্প।"

"আর আপনি ওর কথায় বিশ্বাস করেননি!"

"স্বভাবতই। কী করে করি বলুন?"

"হুম, তারপর?"

"তারপর একদিন রাতে মণি আবার চেঁচিয়ে উঠল। হয়েছে কী, আমি তো বেশ কিছুদিন ওকে আমার ঘরেই শুইয়েছি, যাতে ভয়টা একটু কম পায়। সেদিন আমার অফিস থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। গিয়ে দেখি ও ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর ওকে না ডেকে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। ওর চিৎকার শুনে হুড়মুড়িয়ে ওর ঘরে গিয়ে দেখি, কম্বল জড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। বেডশিটটা ছেঁড়া অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বালিশগুলোকে কে যেন ছিঁড়ে কুচিকুচি করেছে। তুলোটুলো বেরিয়ে সব একাকার। টেবিলটাও মাটিতে ওলটানো। অন্য সময় হলে ভাবতাম, খারাপ স্বপ্নটপ্ন দেখেছে হয়তো। কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখে আমার মেজাজটা গেল খিঁচড়ে। ওকে প্রচণ্ড বকাঝকা করলাম আমি।"

'আর সেখানেই গন্ডগোল পাকিয়েছেন', মনে-মনে বললাম আমি। মুখে বললাম, "মণি কীভাবে রিঅ্যাক্ট করল?"

"ও চমকে উঠেছিল। কান্না থামাল, কিন্তু একটা কথাও বলল না।"

"বুঝেছি, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছেটা তখনই ওর মনে উদয় হয়," বললাম আমি।

ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দীনেশবাবু বললেন, "আমি তা চাইনি, বিশ্বাস করুন।"

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, " সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কোনও বাবাই তা চান না।"

"ওর মায়ের মৃত্যুটা আমাকেও তো প্রভাবিত করেছে।"

"তারপর কী হল বলুন।"

"দু'দিন সব চুপচাপ। আমারও অনুতাপ হচ্ছে ওকে বকার জন্য। ও তো মুখ দিয়ে একটা আওয়াজও আর বের করেনি। দু'দিন পরই ঘটল ঘটনাটা। মণি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। একেবারে ভ্যানিশ। কোনও চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। সকালে ঘুম থেকে তুলতে গিয়ে দেখি বিছানা খালি। অথচ ওখানেই ওকে আগের

রাতে দেখেছি। ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন নেই ঘরে। ওর সব জিনিসপত্র যেখানকার সেখানে।"

"পালিয়েটালিয়ে যায়নি ঠিক জানেন?"

"পালিয়ে যাওয়ার মতো বয়স কি ওর হয়েছে? তা ছাড়া আমরা থাকি তিনতলায়। দরজা, জানলা সব ভিতর থেকে বন্ধ। সিকিওরিটি গার্ডও রাতে অজানা কাউকে ঢুকতে দেখেনি। অপহরণ হওয়ার কোনও

সুযোগই নেই। যদি না ও নিজের ইচ্ছেয় চলে গিয়ে থাকে।"

"পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"অবশ্যই। সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশকে জানাই। ওরা এসে ক্রাইম সিনের ফোটোও নিল। বলল, এটা নাকি অপহরণ ছাড়া কিছুই নয়। আমায় অপেক্ষা করতে বলল, মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসবে তার জন্য। কোনও রকম ধস্তাধ্বস্তি ছাড়া আর কোনও চিহ্ন না রেখে কীভাবে এই অসম্ভব অপহরণ সম্ভব হল, তা কিন্তু বলতে পারেনি পুলিশ। সি সি টিভি ক্যামেরার ফুটেজ চেক করেও ওরা কিছু পায়নি। আমায় বলল ওরা নাকি তদন্ত চালাবে।"

"হুম, তারপর? এখনও নিশ্চয়ই কিছু আছে যা আপনি আমায় বলেননি। নয়তো আমার কাছে আসবেন কেন?"

"কী দেখলেন বিছানার নীচে?"

"পায়ের ছাপ! অথচ একটু আগেও সেখানে একটা দাগও ছিল না। বিরাট বড় সেই পায়ের ছাপ। অন্তত তিন ফুট লম্বা হবে এক-একটা। লাল রঙের। এই দেখুন, আমি ফোটো তুলে এনেছি আপনাকে দেখানোর জন্য।"

বলে উনি নিজের ফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দেন। দু'-তিনটে ফোটো তুলেছিলেন উনি। রক্তের মতো লাল পায়ের ছাপের ফোটো। আর বড্ড লম্বা। এ ছাপ মানুষের নয়। ফোটোগুলো তেমন স্পষ্ট নয়। বুঝলাম আমাকে নিজে গিয়ে দেখতে হবে ছাপগুলো ঠিক করে বোঝার জন্য। দীনেশবাবুকে বলতে উনি আমার হাত ধরে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমি কোনওদিন ভূতে বিশ্বাস করিনি। অন্য সময় হলে আপনার পেশাটিকে ছাইপাঁশ বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু এখন নিজের চোখে... আমার ছেলেকে আপনি বাঁচান অঘোরবাবু।"

আমি হাসলাম। আমি, অঘোর গিরি, একজন অতিপ্রাকৃত বিশেষজ্ঞ। ইংরেজিতে যাকে বলে অকাল্ট স্পেশালিস্ট। আমার পেশায় অবিশ্বাসী লোকেদের সম্মুখীন প্রায়ই হতে হয়। কিন্তু আমরা যে পণ নিয়েছি, যতই কেউ আমাদের অবিশ্বাস করুক, যতই হাসাহাসি করুক বা অপমান করুক, নির্দোষ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে কখনওই পিছপা হব না। দীনেশবাবুকে আশ্বস্ত করে বললাম, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

গ্রে রোডের দিকে যে নতুন ফ্ল্যাটগুলো হয়েছে, তারই মধ্যে একটা কিনেছেন দীনেশবাবু। বিল্ডিংগুলো নতুন। তেমন লোকজনও আসেনি। জায়গাটাও মেন রোড থেকে একটু দূরেই। আশপাশে তেমন বাজারটাজার বা লোকালয় বলতে কিছুই নেই। বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা।

আমার কোনও বিশেষ পরাশক্তি নেই। আমি বিজ্ঞানের সাহায্যেই যে কোনও অতিপ্রাকৃত বা অপার্থিব সমস্যার উৎস খুঁজে বের করি। কিন্তু দীনেশবাবুর ফ্ল্যাটে ঢুকেই বুঝতে পারলাম, এই বাড়ির মধ্যে অশুভ কিছু একটা রয়েছে। মণির বেডরুমটা খুব বড় নয়। আসবাব বলতে

ফোটোতে যেগুলো লাল রঙের লাগছিল, গাঢ় লালচে বেগুনির মতো হয়ে গিয়েছে এখন। অনেকটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মতো। ছাপগুলো মানুষের পায়ের মতোই, কিন্তু বড্ড লম্বা। অত লম্বা মানুষ পৃথিবীতে হয় না। আমি অবশ্য দেখেই বুঝেছি কার পায়ের ছাপ ওগুলো।

ছোট একটা বিছানা, একটা মাঝারি আলমারি, একটা চেয়ার আর-একটা টেবিল। ছোট বাচ্চার সম্পূর্ণ আলাদা ঘর। বিলিতি কায়দা আর কী! বিছানাটা সরাতেই চোখে পড়ল সেই পায়ের ছাপ। ফোটোতে যেগুলো লাল রঙের লাগছিল, গাঢ় লালচে বেগুনির মতো হয়ে গিয়েছে এখন। অনেকটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মতো। ছাপগুলো মানুষের পায়ের মতোই, কিন্তু বড্ড লম্বা। অত লম্বা মানুষ পৃথিবীতে হয় না। আমি অবশ্য দেখেই বুঝেছি কার পায়ের ছাপ ওগুলো।

"কিছু বুঝলেন?" আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন দীনেশবাবু।

"হ্যাঁ, বুঝেছি। বিছানার নীচের রাক্ষসটাই যত নষ্টের গোড়া," বললাম আমি।

"তার মানে? ভূতের কাণ্ড তো?"

"তা তো বটেই। বাড়িগুলোর আগে এখানে কী ছিল খুঁজে বের করতে হবে।"

"কিন্তু আমার ছেলে, সে কোথায়?"

"এখনও সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কিন্তু আমার যত দূর ধারণা, আপনার ছেলে দুটো দুনিয়ার মধ্যে আটকে পড়েছে। বয়স বেশি হলে পুরো পার্থিব শরীরটাকে সরানো সম্ভব হত না।"

দীনেশবাবু যে কিছুই বুঝতে পারেননি, তাঁর মুখ দেখেই বুঝেছি। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললেন, "আজ্ঞে, মাপ করবেন। আমি তো কিছুই..."

দীনেশবাবুকে বোঝানোর জন্য সহজ ভাষায় পুরো ব্যাপারটা বলতে হল, "দেখুন, মৃত্যুর পর কী হয় তা নিয়ে অনন্তকাল ধরে বিজ্ঞানীরা, দার্শনিকরা অনেক গবেষণা, অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। আজও আমরা সত্যটা খুঁজে বের করতে পারিনি। তবে প্যারানরম্যাল সায়েন্স নিয়ে আমরা যারা লেখাপড়া করেছি তারা জানি যে, মৃত্যুই শেষ নয়। দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার পর মানুষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। এই পৃথিবীর সমতলতার বাইরে রয়েছে আর-এক পৃথিবী। আর সেখানেই যায় আমাদের আত্মা। এই দুই দুনিয়ার অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। পার্থিব শরীরে সেই দুনিয়ায় যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইচ্ছেশক্তির চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই। আপনার ছেলে তার মায়ের মৃত্যুতে এমনিতেই প্রভাবিত হয়ে ছিল। তার উপর আপনি ওর ভূতের ভয় পাওয়ার ব্যাপারটিকে বিশ্বাস করেননি। বকাঝকা করার ফলে ওর মধ্যে তৈরি হয় এক প্রবল ইচ্ছে। সব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে। অনেকটা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের মতো। যার শিকার হয় ওর চেয়ে বয়সে বড় মানুষরা।"

"হয় ভগবান!" অশ্রুভরা চোখে বলে উঠলেন দীনেশবাবু।

আমি বললাম, "সেই জন্যই সম্ভব হয়েছে তাকে সশরীরে এই দুনিয়া থেকে অন্য দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া। আর এই কীর্তিটার জন্য দায়ী হচ্ছে ওই বিছানার নীচ থেকে আসা এক প্রাণখেকো।"

"প্রাণখেকো?"

"হ্যাঁ, এক ধরনের পিশাচ বলতে পারেন। হতাশায় জর্জরিত আত্মাই হল এর শিকার। আপনার ছেলের ক্ষেত্রে পুরো

allmagazine.in

পার্থিব শরীরটাকেই অদৃশ্য করে দিয়েছে কোনওভাবে। খুব শিগগিরই আমাদের মণিকে খুঁজে বের করতে হবে।''

''তাই করুন অঘোরবাবু,'' ব্যাকুলভাবে বললেন উনি, ''যা করা দরকার আপনি করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করব। বলুন কীভাবে ফিরে পাব আমার ছেলেকে? কী করে এই প্রাণখেকোটাকে মারা যায়?''

আমি হেসে বললাম, ''প্রাণখেকোকে মারা সম্ভব নয় দীনেশবাবু। তবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় অবশ্যই। সে মণিকেও প্রাণে মারতে পারবে না। কারণ, যতক্ষণ না কেউ নিজের ইচ্ছেয় নিজের আত্মা সমর্পণ করছে, প্রাণখেকোর পক্ষে তার আত্মা নেওয়া সম্ভব নয়। মণি খুবই ছোট এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে। উপরন্তু এখন খুব সম্ভবত সে ভয় পেয়ে আছে। আজ রাতেই আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব আমরা। আপনি আর চিন্তা করবেন না।''

রাত তখন একটা। আমার তড়িৎ চুম্বকীয় সেন্সরটায় একটা রিডিং নিয়ে দেখলাম মণির ঘরের মধ্যে অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে।

''জিনিসটা কী বলুন তো?'' এই অবস্থাতেও দীনেশবাবু ওঁর কৌতূহল চাপতে পারলেন না।

''এটা একটা ই এম এফ মিটার,'' বললাম আমি, ''ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তির হেরফের এতে ধরা পড়ে। তাতেই আমরা ভৌতিক কাণ্ডকারখানার উৎস খুঁজে বের করতে পারি।''

''তা এখন কী বুঝছেন ওটা দেখে?''

কিছুক্ষণ দেখার পর আমি বলে উঠলাম, ''এই তো পেয়েছি। একটা ফাটল। ওই বিছানাটার ঠিক নীচে। দুটো দুনিয়ার মধ্যে চলাফেরা করার জন্য দিব্যি একটা দরজার মতো। মনুষ্যচক্ষে দেখা যায় না।''

''তা হলে এবার?''

আমি আমার ব্যাগ থেকে বের করলাম এক প্যাকেট সৈন্ধব লবণ, দুটো মোমবাতি, একটা মন্ত্রের বই, আর-একটা বাক্স যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত পাউডার যা আমি সংগ্রহ করেছি সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। দুটো মোমবাতি জ্বাললাম বিছানাটার সামনে। তারপর সৈন্ধব লবণ ছড়িয়ে দিলাম বিছানাটার চারপাশে। ঘরের অন্যান্য আলো সব নিভিয়ে দিয়ে মোমবাতিগুলোর সামনেই মেঝেতে আমি আর দীনেশবাবু পাশাপাশি বসলাম। নির্দিষ্ট দাগ দেওয়া পাতটায় মন্ত্রের বইটা খুলে আমি একটি বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলাম।

প্রথম পাঁচ মিনিট কিছুই হল না। দীনেশবাবু যে নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছেন কিছু একটা ঘটার জন্য বেশ বুঝতে পারছি। হঠাৎ বন্ধ ঘরের মধ্যে কোথা থেকে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল। দীনেশবাবু শিউরে উঠলেন। আমি মন্ত্র পড়ে চললাম।

মণির বিছানার নীচে হঠাৎ একটা হলুদ রঙের আলো একবার ঝলসে উঠেই নিভে গেল। সঙ্গে আবার হাওয়া বয়ে যেতেই মোমবাতিদুটোও নিভে গেল। ঘর এখন পুরো অন্ধকারে। ভয়ে দীনেশবাবু আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

''ভয়ের কিছু নেই,'' আমি নিচুস্বরে বললাম, ''যথেষ্ট সৈন্ধব ছড়িয়েছি ঘরের মধ্যে। আমাদের কোনও রকম ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা নেই।''

এবার বিছানার নীচে আবার সেই আলোটা দেখা গেল। হাওয়ায় ভাসতে থাকা সেই বিমূর্ত আলোটা ঘরটাকে হালকাভাবে আলোকিত করে তুলল। সেই আলোতেই আমরা দেখলাম মণির বিছানার উপর আস্তে-আস্তে একটা ছায়ামূর্তি আকার ধারণ করতে লাগল। ছায়ামূর্তিটা মানুষেরই কিন্তু অন্তত ন'ফুট লম্বা আর বেশ শক্তপোক্ত পেশিবহুল চেহারা। প্রাণখেকোটা মেঝের উপরই দাঁড়িয়ে। কিন্তু যেন বিছানাটা ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন একটা হলোগ্রাম। আমরা অবশ্য প্রাণখেকোটার রূপ দেখতে পাইনি। দেখতে চাইনি। ওই অপার্থিব আলোয় আমরা দেখলাম তার স্রেফ একটা সিল্যুয়েট।

''কে তুমি?'' আমি শান্তভাবেই জানতে চাইলাম।

এক মুহূর্তের অপেক্ষার পর উত্তর এল। একটা ঠান্ডা, গভীর এবং বিশ্রী পুরুষকণ্ঠে প্রাণখেকোটা বলল, ''আত্মা চাই।''

ইতিমধ্যে দীনেশবাবু ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছেন। আমি আবার প্রাণখেকোটাকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, ''বাচ্চা ছেলেটাকে তুমি নিয়েছ?''

''আত্মা চাই।''

''আমরা আমাদের আত্মা উৎসর্গ করব না,'' দৃঢ় কণ্ঠে বললাম আমি।

এবার প্রাণখেকোটা চুপ। অন্তত কুড়ি সেকেন্ড পর সে আবার মুখ খুলল, ''ছেলেটা... আমার।''

''এক্ষুনি তাকে ফিরিয়ে দাও,'' অনেকটা আদেশের সুরে বললাম আমি।

''ছেলেটা... আমার।''

আমি প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করলাম। এর মধ্যে রয়েছে একটা বিশেষ, গন্ধহীন, রংহীন তরল। চাইলে এক মিনিটের মধ্যে পিশাচটাকে ধরাশায়ী করতে পারি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মণিকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা। চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

আমি আবার শান্ত গলায় বললাম, "দেখো, বাচ্চা ছেলেটা তোমার দুনিয়ার নয়। ওকে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই দুনিয়া থেকে নিয়ে গিয়েছ তুমি। ওকে ফিরিয়ে দাও।"

"ওর ইচ্ছেতেই। ও আমার!"

শিশিটার ছিপি খুলে বিছানার কাছে একটু এগিয়ে গেলাম আমি। দীনেশবাবু বোধ হয় আমাকে বাধা দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তোয়াক্কা করলাম না।

"ওকে ফিরিয়ে দাও," আমি আবারও বললাম, "নয়তো..."

কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সেই অপার্থিব আলোটা কয়েকবার কেঁপে উঠল। আর সেই সঙ্গে শুরু হল এক বিকট অট্টহাসি। কোনও কারণে প্রাণখেকোটার বড় আহ্লাদ হচ্ছে।

"হা হা হা হা হা হা হা হা..."

"কী ব্যাপার, কী ব্যাপার!" কাঁপা গলায় বললেন দীনেশবাবু।

আমিও যে অবাক হইনি, তা নয়।

"হা হা হা হা হা ...আ আ আ আ আ আ আ আ হ..."

আলোটা এবার প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে শুরু করল। আর সেই কাঁপা-কাঁপা আলোতেই আমরা দেখলাম, বিছানাটার উপরে আকার নিল একটা দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি। সেই দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিটা প্রাণখেকোটাকে চেপে ধরল। দুটো ছায়ামূর্তি তারপর যেন কুস্তি লড়তে লাগল। এই বহির্জগতীয় ধ্বস্তাধস্তি দেখে আমরা তো তাজ্জব। প্রায় এক মিনিট ধরে যুদ্ধ চলার পর সেই আলোটা আবার দপদপ করে উঠল, আর সেই আলোতে আমরা দেখলাম স্রেফ একটা ছায়ামূর্তিই এখন দাঁড়িয়ে আছে আর সেটা যে প্রাণখেকোর নয়, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আর তখনই দেখতে পেলাম...

"আরে, এ তো ... এ তো..." দীনেশবাবু কিছু একটা বলতে গেলেন। দৃশ্যটা দেখে আমিও নির্বাক। ছায়ামূর্তিটার কোলে একটা ছোট বাচ্চার আবছা আকার। আরও কয়েকবার আলোটা কেঁপে উঠে, দু'-তিনবার ফ্ল্যাশ হয়ে একেবারে নিভে গেল। মোমবাতিগুলোও আবার আপনা হতেই জ্বলে উঠল।

"আলো জ্বালান!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "আলো জ্বালান।"

আর কালবিলম্ব না করে ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলেন দীনেশবাবু। জ্বালাতেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা বিস্ময়সূচক আওয়াজ আর তার সঙ্গে আমার দীর্ঘশ্বাস। বিছানার উপরে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে পাঁচ বছরের একটা ফুটফুটে ছেলে। যেন কিছুই হয়নি এমন তার অঙ্গবিন্যাস। বলাবাহুল্য, মণি ফিরে এসেছে।

আলোটা এবার প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে শুরু করল। আর সেই কাঁপা-কাঁপা আলোতেই আমরা দেখলাম, বিছানাটার উপরে আকার নিল একটা দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি। সেই দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিটা প্রাণখেকোটাকে চেপে ধরল। দুটো ছায়ামূর্তি তারপর যেন কুস্তি লড়তে লাগল।

সকালবেলায় মণি সাধারণভাবেই ঘুম থেকে উঠল। সারা রাত দীনেশবাবু আর আমি ওর বিছানার পাশেই ছিলাম। কোনও অস্বাভাবিক কিছু আর ঘটেনি। তবে আমার এখনও কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি। মণিকে কয়েকটা জিনিস জিজ্ঞেস করব বলাতে কৃতজ্ঞতার খাতিরেই দীনেশবাবু আর আপত্তি করেননি।

"তোমার কিছু মনে আছে মণি?" জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

ছোট্ট মণি আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল শুধু। অর্থাৎ হ্যাঁ, মনে আছে।

"একটা খুব বাজে স্বপ্ন দেখলে কাল, তাই না?" হেসে বললাম আমি, "তবে তুমি ঠিক কোথায় ছিলে মণি?"

"একটা ঠান্ডা ঘরে। আর কী অন্ধকার সেটা। আমার খুব ভয় করছিল।"

"আর ভয়ের কিছু নেই। আচ্ছা, স্বপ্নের মধ্যে তুমি কাউকে দেখেছ কি? কোনও রাক্ষসটাক্ষস?"

পিশাচটা যে তার আসল রূপ একটা বাচ্চাকে দেখাবে না, তা আমি জানতাম। কিন্তু তাও নিশ্চিত হওয়ার জন্যই জানতে চাইলাম।

"না, কিন্তু..."

"কিন্তু?"

"মাকে দেখেছি।"

"মাকে?" দীনেশবাবু অবাক কণ্ঠে বলে উঠলেন। "কিন্তু সে তো..."

ইশারায় ওঁকে চুপ করতে বলে আমি মণিকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা কি তোমায় কিছু বললেন?"

"হ্যাঁ, বললেন তো। বললেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর বাপি তো রয়েইছেন।"

"তারপর?"

"তারপর মা আমায় ওই ঠান্ডা জায়গাটা থেকে কোলে তুলে নিলেন আর আমার বিছানায় শুইয়ে দিলেন।"

একজন মৃত ব্যক্তির আত্মা যে নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্য আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল, ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই সঙ্গে মনের মধ্যে এক পরম শান্তি অনুভব করলাম। মনে-মনে মণির মাকে ধন্যবাদ জানালাম।

মণির দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, "তোমার মা তো ঠিকই বলেছেন। সত্যি আর ভয়ের কিছু নেই।"

ই এম এফ মিটারটা ব্যাগে ভরতে-ভরতে বললাম, "তোমার বিছানার নীচের রাক্ষসটা পালিয়ে গিয়েছে। আর কোনওদিন ফিরে আসবে না। আলোটা শেষবারের মতো নিভে যাওয়ার পর আর ঘরের মধ্যে কোনও অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব ধরা পড়েনি আমার যন্ত্রে। দুই দুনিয়ার মধ্যেকার ফাটলটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার কোনও রাক্ষসটাক্ষস এলে তোমার বাপিই মোকাবিলা করবেন," বললাম আমি।

দীনেশবাবুর দিকে আড়চোখে তাকাতে দেখি, তাঁর দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে।

ছবি: সৌমেন দাস

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি

সুরথ চক্রবর্তী
ষষ্ঠ শ্রেণি, বারুইপাড়া হাই স্কুল, হুগলি।

আমার ছবি

অনিরুদ্ধ দে
জিয়াগঞ্জ বীরেন্দ্র সিং সিংঘী উচ্চ বিদ্যালয়।

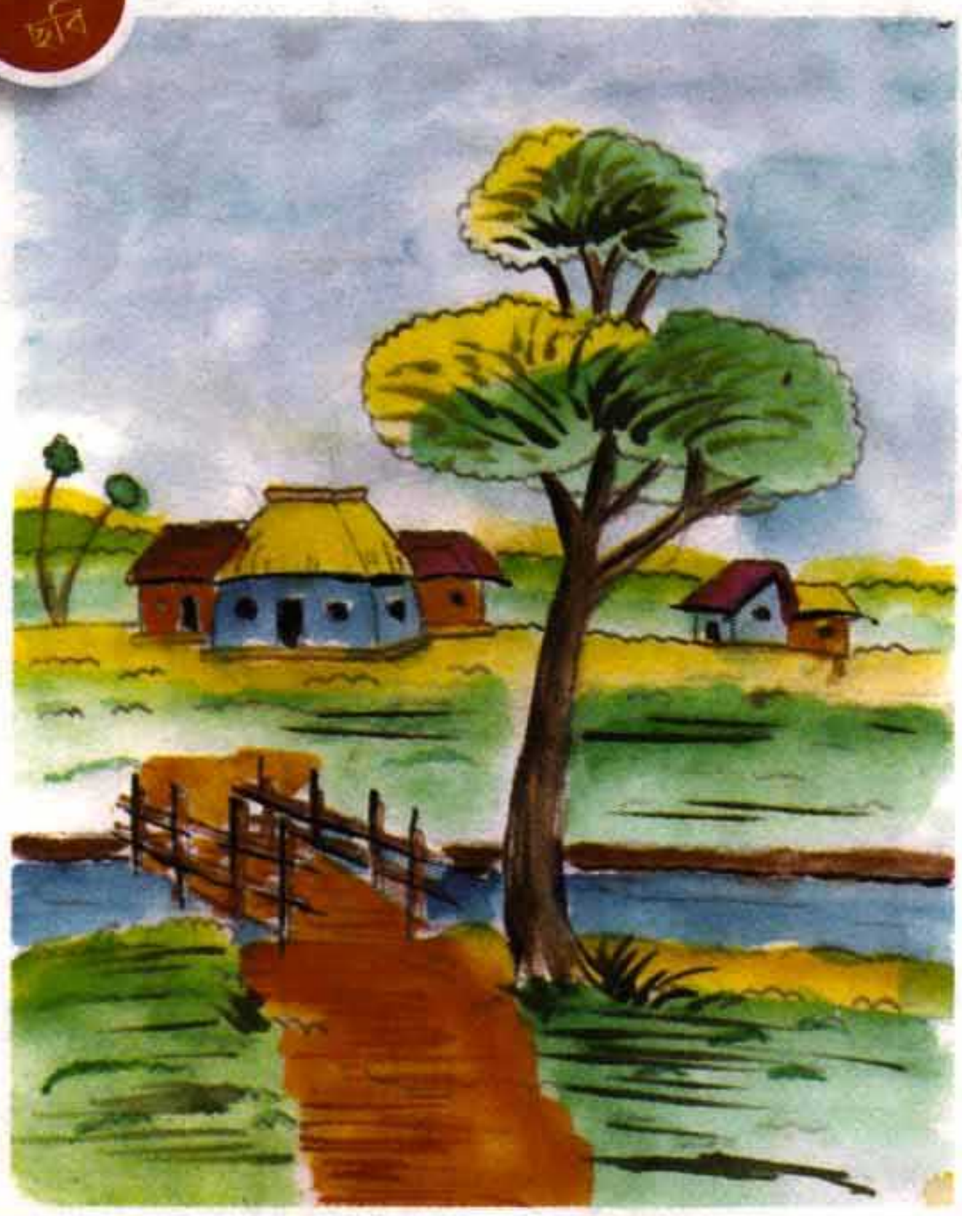

আমার লেখা

ঋদ্ধিজিৎ রায়
চতুর্থ শ্রেণি, পাঠভবন, কলকাতা।

ফটিকের গাছে চড়া

বলতে গেলে ফটিকের এখন নাজেহাল অবস্থা। ব্যাটা একেবারে লম্বকর্ণ হয়ে বলেছিল, সে গাছে উঠতে পারে। বলেই ইয়া মস্ত একটা লাফ দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরল। গাছের আধখানা পর্যন্ত উঠেছে কী ওঠেনি, একদম দুম ফট ফট ফটাস। তারপর বলেছিল এ তো শুধু একটা পা ফসকে গিয়েছে, পরের বার বাঁদরের চেয়েও তাড়াতাড়ি উঠবে। আমার মনে হয়েছিল, পিঁপড়ের থেকেও যে ধীর, সে বাঁদরের মতো তরতর করে গাছে উঠবে কী করে! তাও বলেছিলাম, "ঝুঁকি নিস না। পড়ে গেলে দাঁত কপাটি লেগে যাবে।" সে পাত্তা দেয়নি। উলটে বলেছিল, যা প্রাণে চায় করবে, আমি বলার কে! সেদিন শুনলাম ও হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। বাঁচা গেল। কিন্তু আবার যদি পা পিছলে আলুর দম হয়? ওকে চোখে-চোখে রাখা উচিত।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও।

মিতুলের বুদ্ধি

জয় সেনগুপ্ত

নতুন জায়গাটা ভারী ভাল লেগে গিয়েছে মিতুলের। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চারপাশ শান্ত, মনোরম। পাখপাখালির ডাক আর নয়নাভিরাম দৃশ্য। সকালবেলা প্রকৃতি এক রকম, রাতের বেলা সম্পূর্ণ অন্য, এক মায়াবী জগৎ যেন। বিশেষ করে চাঁদনি রাতে উছলে পড়া জ্যোৎস্নায় গাছের ছায়ায় আলপনা আঁকা রাস্তায় বাবার হাত ধরে হাঁটতে দারুণ লাগে মিতুলের। মনে হয় যেন এক রূপকথার জগৎ।

মিতুলের বাবা ক'দিন হল বদলি হয়ে এসেছেন জলপাইগুড়ির এই জায়গাটায়। কলকাতা থেকে চলে আসতে হবে শুনে মিতুলের মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু এখন তার মনে হয়, কলকাতার ঘিঞ্জির চেয়ে এ জায়গা অনেক ভাল।

এখানে নতুন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে তাকে। মিতুলের

এখন ক্লাস নাইন। কলকাতার বন্ধুবান্ধবরা কেউ নেই। নতুন স্কুলে নতুন-নতুন বন্ধু হচ্ছে মিতুলের। তবে নতুন জায়গায় নানা রঙের পাখিরাও তার বন্ধু। প্রতিদিন সকালে বাড়ির সামনের গাছগুলোয় যেসব পাখি আসে, সেগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছে সে। ছাতারে, ফিঙে, বউ কথা কও, টুনটুনি, বেনেবউ, মৌটুসি কত রকম পাখি! পাখিগুলোর কাছে গেলে এখন আর মিতুলকে দেখে পালায় না তারা। ভোরবেলা উঠে অনেকক্ষণ ধরে এদের মজাদার সব গতিবিধি লক্ষ করে মিতুল। রং-বেরঙের পাখি এসে বসছে, কিচিরমিচির করছে, কেউ সুরেলা কণ্ঠে ডেকে চলেছে, কোনওটা হয়তো ঝগড়া বাধিয়েছে অন্য আর-একটার সঙ্গে। কিছুক্ষণ এই সব দেখে, স্নান-খাওয়া সেরে স্কুলে চলে যায় সে।

আজ মিতুলের খুব আনন্দের দিন। ছোটমামা এসেছে কলকাতা থেকে। ছোটমামা ঘুরতে ভালবাসে। ব্যাঙ্কে চাকরি করে আর ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়ে। কত জায়গা যে বেড়িয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বলতে গেলে সারা ভারতই ঘোরা হয়ে গিয়েছে। বিয়েথা করেনি এখনও। বাড়িতে লোক বলতে মা, বড়দা আর বউদি।

তার আর-একটা শখ আছে, সম্প্রতি কলকাতার শুটিং ক্লাবের মেম্বার হয়েছে সে। কোনও কম্পিটিশনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে নেই। জাস্ট একটা হবি বলা যেতে পারে এটাকে। ইদানীং যেখানেই বেড়াতে যায়, সঙ্গে করে এয়ারগান নিয়ে যায়। এবারেও নিয়ে এসেছে, টার্গেট প্র্যাকটিস করবে।

ছোটমামা এলে মিতুলকে আর পায় কে! এ বাড়িতে আসামাত্র তাকে আর ছাড়ছে না মিতুল। স্টকে অনেক গল্প আছে ছোটমামার, সেগুলো সব শুনতে হবে তো।

ঘরে ঢোকার পর থেকে ছোটমামার পায়ে-পায়ে ঘুরতে লাগল মিতুল। মা বললেন, "আগে ওকে জিনিসপত্র রাখতে দে। অত দূর থেকে এসেছে, একটু বিশ্রাম করুক, তারপর জ্বালাতন করবি।"

মিতুলের রাগ হল। খাটে উঠে চুপ করে বসে রইল সে।

ছোটমামা ব্যাগ থেকে বের করল এক সেট জামা-প্যান্ট, মিতুলের জন্য। বলল, "এখনই পরে দেখ মিতুল, ফিট করেছে কি না।"

জামা-প্যান্ট হাতে নেওয়ার পর মিতুলের চোখ পড়ল জিনিসটার উপর। মাটিতে শোয়ানো ছিল বলে এতক্ষণ চোখে পড়েনি। প্রায় হাতচারেক লম্বা প্লাস্টিকের কভারের মধ্যে কিছু একটা রয়েছে। কভারটা দেখে মিতুলের বুঝতে অসুবিধে হল না ভিতরে কী আছে।

"ছোটমামা, তুমি এয়ারগান নিয়ে এসেছ?" মায়ের বারণ অগ্রাহ্য করে খাট থেকে নেমে ছোটমামার পাশে এসে দাঁড়াল সে। ছোটমামার এয়ারগানটা আজ পর্যন্ত দেখার সুযোগ হয়নি মিতুলের।

ছোটমামা মিতুলের দিকে তাকিয়ে তার সেই বিখ্যাত হাসিটা হাসল, "এখন নয়। ট্রেন জার্নিতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আজ বিশ্রাম। কাল সকালে বের করব ওটা।"

মিতুল বলল, "তুমি এখন ক'দিন থাকছ তো ছোটমামা?"

"হ্যাঁ, চার-পাঁচদিন থাকব আর জমিয়ে এয়ারগান চালাবি তুই। পরীক্ষাও তো শেষ হয়ে গিয়েছে তোর। তাই তো, না কি?" ছোটমামা খাটে উঠে আরাম করে বসলেন।

ঠিক সময়েই এসেছে ছোটমামা। সবে শেষ হয়েছে মিতুলের ক্লাসের পরীক্ষা। এখন আর পড়ার চাপ নেই। সারাদিন ঘুরতে পারবে মামার সঙ্গে।

পরদিন সকালে একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠল মিতুল। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছে ছোটমামার সঙ্গে। দেখল, ছোটমামা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে একমনে চারপাশ দেখছে। মিতুল গিয়ে পাশে দাঁড়াল।

"এয়ারগানটা বের করলে না? আমি নিয়ে আসব গিয়ে?" মিতুল তড়বড় করে বলল।

"দাঁড়া, এখন নয়। জলখাবার খেয়ে তারপর। খালিপেটে টার্গেট প্র্যাকটিস করা যায় না," ছোটমামা হাত-পা ছড়িয়ে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ় করতে লাগল।

ইতিমধ্যে মিতুলের বাবাও এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। ছোটমামাকে বললেন, "তুমি কি কোচবিহারে এই প্রথম এলে মলয়?"

"না, প্রথম নয়। অনেক আগে একবার এসেছিলাম। তারপর এদিকটা আর আসা হয়নি। কোনও কিছুই মনে নেই এখন।"

ছোটমামা মিতুলের কাঁধে হাত রেখে বলল, "নানা রকম পাখি রয়েছে দেখছি এখানে। কলকাতায় তো পাখি দেখতেই পাই না। কাল তোকে নিয়ে বেরব পাখি শিকারে।"

মিতুল তাকাল ছোটমামার দিকে। তার মুখটা থমথমে হয়ে উঠল একটু। ছোটমামা সেটা লক্ষ করে বলল, "কী রে মিতুল, এয়ারগান দিয়ে পাখি শিকার করবি তো?"

মিতুল কী একটু ভাবল, তারপর আনন্দে একেবারে ডগমগ হয়ে বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। প্রচুর পাখি আছে এখানে। টিপ প্র্যাকটিসও হবে, পাখি শিকারও।"

"বক আছে? তা হলে এয়ারগান দিয়ে বক মারব। বকের মাংস খাওয়া যাবে," ছোটমামা হাত দিয়ে বন্দুক ছোড়ার ভঙ্গি করল।

"হ্যাঁ, ঝিলপাড়ে প্রচুর বক আছে। ওই ডান দিকের রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগোলেই ঝিল। ওখানে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা," বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল মিতুল।

"এখন কিন্তু পাখি মারা সরকারিভাবে নিষেধ মলয়!" বাবা বললেন।

"আরে কাঞ্চনদা, কে আর দেখতে যাচ্ছে! ফাঁকা জায়গা তো। কিচ্ছু হবে না," ছোটমামা হাসল।

মিতুল তাকিয়ে রইল তার ছোটমামার দিকে। কী যেন ভাবছিল সে।

"আজ রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বি মিতুল, কাল ভোর-ভোর উঠে বেরিয়ে পড়ব," ছোটমামা বলল।

ঘরে ঢুকে মিতুল বলল, "এয়ারগানটা বের করো এবার ছোটমামা।"

ছোটমামা কভার খুলে বের করল বন্দুকটা। মিতুল হাতে নিল। বেশ ভারী।

"গুলি কোথায়?" মিতুল প্রচণ্ড উত্তেজিত।

"এই দ্যাখ," ছোটমামা একটা ছোট্ট বাক্স এগিয়ে দিল মিতুলের দিকে, "এর মধ্যে আছে।"

বাক্সটা খুলে মিতুল বের করল দুটো গুলি। ছোট-ছোট, বেলুন ফাটানোর জন্য যেরকম গুলি ব্যবহার করা হয়, সেরকম।

"এগুলোকে বলে পেলেট। আমার এয়ারগান খুব শক্তিশালী। ঠিকমতো টিপ করে মারতে পারলে, এক গুলিতেই একটা বক ঘায়েল হয়ে যাবে," ছোটমামা বলল।

"মরে যাবে একেবারে?" মিতুল প্রশ্ন করল।

"মরে হয়তো যাবে না, তবে আধমরা

তো হবেই। আর, তারপরই গিয়ে ধরে ফেলতে হবে ব্যাটাকে।"

সন্ধেবেলা ছোটমামা ভাল করে এয়ারগানটা গান-অয়েল দিয়ে পরিষ্কার করল। মিতুল সমানে বসে রইল পাশে। পরিষ্কার করা হয়ে গেলে এয়ারগানটা মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রাখল দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে আর গুলির বাক্সটা রাখল গানটার পাশেই।

পরদিন খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ল মিতুল, সবার আগে। ছোটমামা তখনও ওঠেনি। তাকে ঠেলে তুলল মিতুল। তারপর বলল, "রেডি হয়ে নাও ছোটমামা। আজ অনেক পাখি মারতে হবে।"

চোখমুখ ধুয়ে তৈরি ছোটমামা। এয়ারগানটা নিয়ে মিতুলের হাতে দিয়ে বলল, "ধর এটা। আমি গুলির বাক্সটা নিয়ে নিই।"

গুলির বাক্সটা দেখতে পেল না ছোটমামা। এয়ারগানের পাশেই রেখেছিল ওটা। ছোটমামা অবাক হল। মিতুলকে বলল, "গুলির বাক্সটা তো এখানেই রেখেছিলাম, তাই না?"

"হ্যাঁ, আমার সামনেই তো রাখলে!" আশ্চর্য হয়ে বলল মিতুল।

"দ্যাখ তো, মাটিতে রয়েছে দেখে ওটা

কেউ সরিয়ে রেখেছে কি না!"

তন্ন-তন্ন করে সারা বাড়ি খোঁজা হল, কোথাও বাক্সটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কাজের মাসি খুব সকালে কাজ করতে আসে, তাকে জিজ্ঞেস করা হল। সে আকাশ থেকে পড়ল। বলল, "আমি তো এই ঢুকলাম গো! এই ঘরে এলাম কখন! তোমরাই কোথায় রেখেছ মনে করে দ্যাখো।"

ছোটমামা রেগেমেগে বলল, "এ কি ভৌতিক কাণ্ড নাকি? বেমালুম উধাও হয়ে গেল বাক্সটা!"

মা বললেন, "গুলির বাক্সটা ঠিক এনেছিলি তো বাড়ি থেকে?"

শুনে ছোটমামা আরও রেগে গেল। বলল, "কী যে বলো না দিদি! মিতুল গুলিগুলো হাতে নিয়ে দেখল, তারপর বাক্স বন্ধ করে গানটার পাশে রাখলাম!"

"তা হলে কী হবে ছোটমামা, বকের মাংস খাওয়া হবে না!" কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল মিতুল।

"এখানে কোথাও এয়ারগানের দোকান আছে মলয়দা? থাকলে গুলি কিনে নিতাম," মিতুলের বাবাকে জিজ্ঞেস করল ছোটমামা।

"না, এখানে নেই কোথাও। কলকাতা ছাড়া মনে হয় না পাবে কোথাও," বাবা বললেন।

"তা হলে তো হয়ে গেল! আবার যখন আসব... মিতুল এবার আর বকের মাংস খাওয়া হল না তোর," ছোটমামা গম্ভীর মুখে বলল।

বিকেলে আবার একবার সব জায়গা খোঁজা হল। কিন্তু আশ্চর্য, গুলির বাক্সটা পাওয়া গেল না কোথাও!

মিতুলকে দেখেই বোঝা গেল ভীষণ মনখারাপ হয়ে গিয়েছে তার। একবার বন্দুকটার দিকে আর-একবার ছোটমামার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই বাক্স ছাড়া তোমার কাছে আর বাড়তি গুলি নেই?"

"না রে, ওই বাক্সেই ছিল সব। তোমাদের ঘরে বাইরের কুকুর ঢোকে? এই ঘরটা খুললেই তো বাইরের পথ," ছোটমামা প্রশ্ন করল মিতুলের বাবাকে।

"দরজা খোলা থাকলে কখনও-সখনও ঢুকে পড়ে খাবারের লোভে। সব কুকুর তো ঢোকে না, ওই বাদামি রঙের যে কুকুরটা কাল দেখলে ঘুরঘুর করছিল বাড়ির সামনে, ওটা মাঝে-মাঝে ঢুকে পড়ে। মিতুল খুব ভালবাসে তো ওটাকে। রোজ দু'বেলা খেতে দেয়," বাবা বললেন, "কেন বলো তো?"

"তা হলে ওটাই হয়েছে। কুকুর ঢুকে মুখে করে টেনে নিয়ে গিয়েছে বাক্সটা," ছোটমামা বলল।

"তা হতে পারে। হয়তো ভেবেছে খাবার আছে," বাবা বললেন।

ছোটমামা গুম হয়ে গেল। মিতুলও মনখারাপ করে বসে রইল তার মামার পাশে।

চার-পাঁচদিন থাকার কথা ছিল ছোটমামার, কিন্তু মলিন মুখে দু'দিন পরই রওনা দিল কলকাতার উদ্দেশে। মিতুলকে সান্ত্বনা দিয়ে গেল, এয়ারগান নিয়ে আবার আসবে শীতকালে।

ছোটমামা চলে যেতেই মিতুল হাসতে শুরু করল। হাসতে-হাসতে চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল ওর। মা-বাবা দু'জনেই আশ্চর্য হয়ে বললেন, "হাসছিস কেন মিতুল?"

মিতুল বলল, "হাসব না? ওই গুলির বাক্সটা পাওয়া যাবে ছাদে চিলেকোঠার ঘরে যে পুরনো জুতোর বাক্সটা আছে তার মধ্যে।"

"তার মানে?" বাবা ভ্রু কোঁচকালেন।

"ছোটমামার পাখি শিকার বন্ধ করার এই একটাই রাস্তা ছিল," বিজ্ঞের মতো মুখভঙ্গি করল মিতুল।

"তা হলে পাখি শিকার করবি বলে অত আনন্দ করছিলি যে! আমরাও আশ্চর্য হয়েছিলাম, পাখি এত ভালবাসিস তুই, সেই পাখি মারার কথা শুনে তোর এত উৎসাহ কেন!" বাবা হাত রাখলেন মিতুলের কাঁধে।

"আসলে আমি অভিনয় করছিলাম, যাতে ছোটমামা আমাকে সন্দেহ না করে। ছোটমামা পাখি শিকারের কথা বলামাত্র আমি মনে-মনে প্ল্যান করে ফেলেছিলাম, গুলির বাক্সই সরিয়ে দেব। খুব ভোরে, ছোটমামা ঘুম থেকে ওঠার আগেই সরিয়ে দিয়েছি ওটা। এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। বারণ করলে তো আর ছোটমামা শুনত না। সে তো তুমিও বলেছিলে পাখি মারা নিষেধ সরকারিভাবে। ছোটমামা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল তোমার কথা," গম্ভীর হয়ে বলল মিতুল।

মা বললেন, "তুই তো সাংঘাতিক অভিনয় করতে পারিস! আমরা কিছু বুঝতেই পারিনি!"

মিতুল মুচকি হাসল।

বাবা বললেন, 'শীতকালে আবার যদি তোর ছোটমামা এয়ারগান আর গুলি নিয়ে আসে তখন কী করবি?"

"সে তখন দেখা যাবে," মিতুল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস স্বরে বলল।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

আমার বন্ধু

আমার অনেক বন্ধু আছে। কিন্তু প্রিয় বন্ধু বলে যদি কেউ থাকে, সে আমার বাবা। বাবা আমাক খুব ভালবাসে। যখনই সময় বের করতে পারে, আমাকে পার্কে ঘুরতে নিয়ে যায়। কত মজা করি সেখানে। দোলনা চড়ি, স্লিপ চড়ি, কখনও ঢেঁকিও চড়ি। পার্কের গেটে ফুচকা নিয়ে বসে যে দাদা, তার কাছ থেকে কোনও-কোনও দিন আমি আর বাবা ফুচকা খাই। ঝালমুড়িওয়ালার কাছ থেকে ঝালমুড়ি কিনি। বাবা কখনও বারণ করে না এসব খেতে। মা হলে দিত না। পাড়ায় বা দূরে যখন মেলা বসে বাবা আর আমি সেখানে যাই। খুব আনন্দ করি। মেলা থেকে বাবা আমাকে পুতুল, খেলনা, কাচের চুড়ি কিনে দেয়। এবার জন্মদিনে বাবা আমাকে রুপোর পায়ের তোড়া আর আংটি কিনে দিয়েছে। রোজকার লেখাপড়াতেও বাবা আমাকে অনেক সাহায্য করে। পড়া হয়ে গেলে আমি আর বাবা বানিয়ে-বানিয়ে কবিতা, ছড়া, গল্প লিখি। বাবা আমাকে কথা দিয়েছে সব সময় পাশে থাকবে, কখনও ছেড়ে যাবে না।

মেঘা কর্মকার
ষষ্ঠ শ্রেণি, শ্রীশিক্ষা নিকেতন, কলকাতা।

আমার প্রিয় বন্ধু বাবা

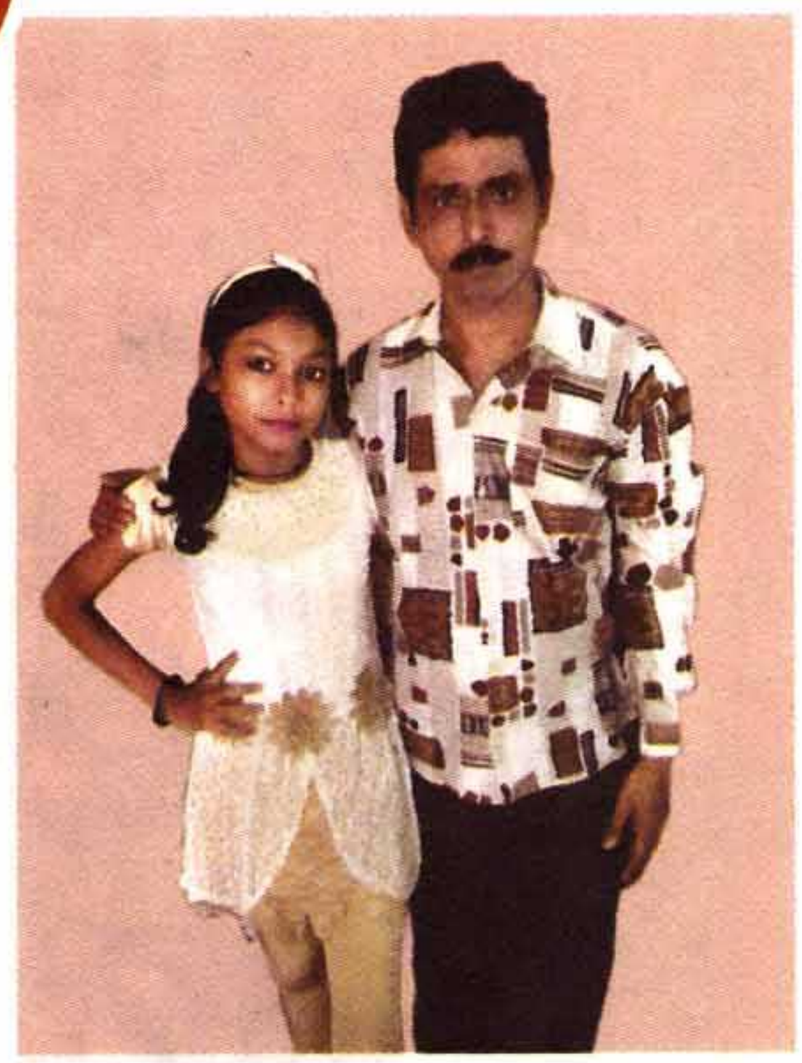

দ্যাখো, ভাবো আর আঁকো

ছবি আঁকতে সবাই ভালবাসে। তাই এই ছবি আঁকার বিভাগ। এখানে আঁকা অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করো দেখি। আঁকা শেষ হলে রং করে ফ্যালো ছবিটাকে।

ছবি: কুনাল বর্মণ

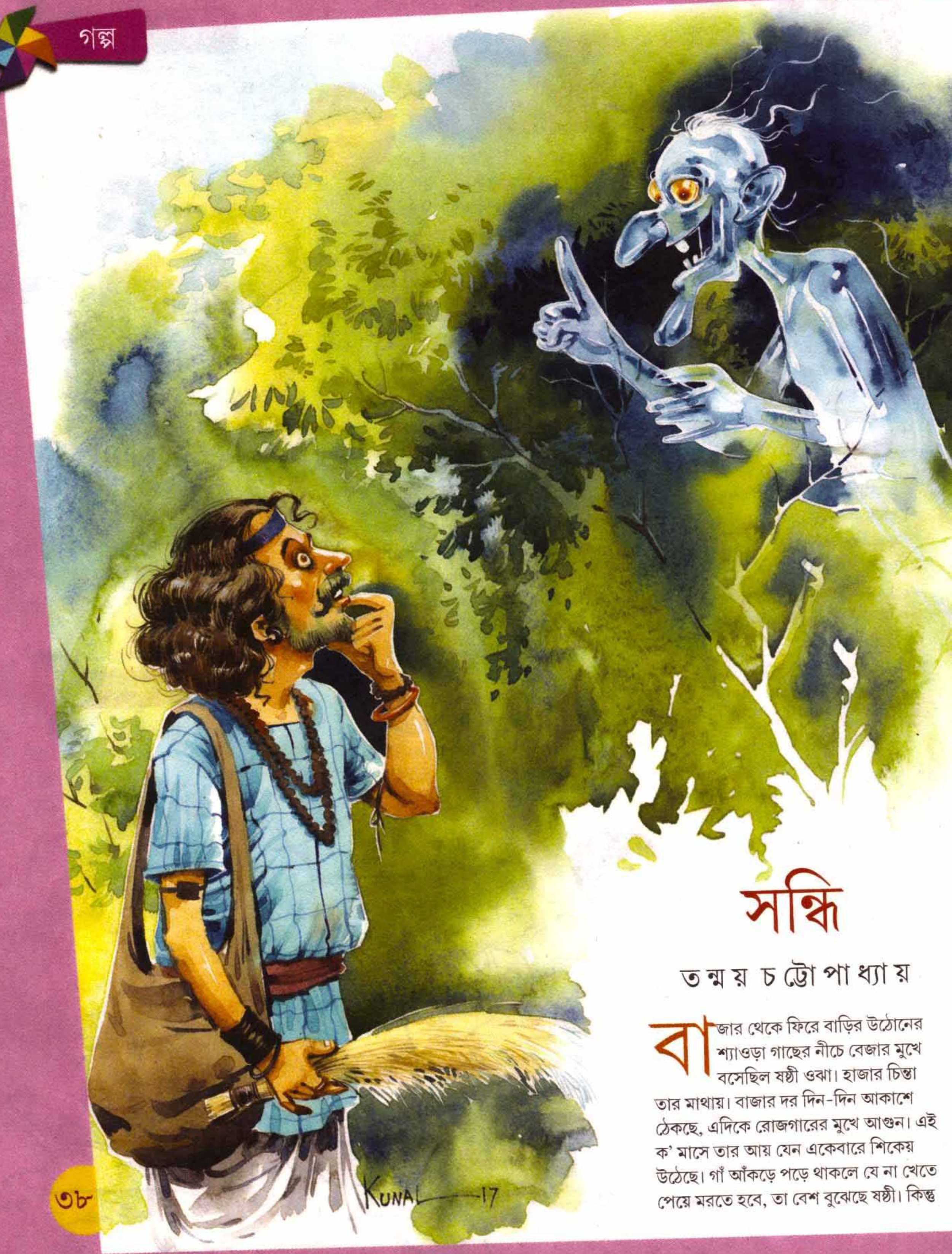

সন্ধি

তন্ময় চট্টোপাধ্যায়

বাজার থেকে ফিরে বাড়ির উঠোনের শ্যাওড়া গাছের নীচে বেজার মুখে বসেছিল ষষ্ঠী ওঝা। হাজার চিন্তা তার মাথায়। বাজার দর দিন-দিন আকাশে ঠেকছে, এদিকে রোজগারের মুখে আগুন। এই ক' মাসে তার আয় যেন একেবারে শিকেয় উঠেছে। গাঁ আঁকড়ে পড়ে থাকলে যে না খেতে পেয়ে মরতে হবে, তা বেশ বুঝেছে ষষ্ঠী। কিন্তু

হুট করে সে যাবেই বা কোথায় আর করবেই বা কী?

এই নন্দীপুরে তাদের চার পুরুষের বাস। বাপঠাকুরদার মতো ষষ্ঠীও ভূত ছাড়ানোর কাজই করে। সরষে পোড়া, লঙ্কা পোড়া দিয়ে যজ্ঞ করে ভূতের বাপের পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করতে পারে ষষ্ঠী। কত ভূতের যে রাতের ঘুম ষষ্ঠী বরবাদ করেছে তা দশটা গ্রামের লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। কিন্তু ভূতের বাজারে যে এমন গেরন লাগবে তা কী আর ষষ্ঠী জানত? তিন-তিন মাস হয়ে গেল পাশের দশ-দশটা গ্রামে একটাও ভূতে ধরার কেস নেই। এদিকে তিন মাসে যে তিন জোড়া অপঘাতে মৃত্যু আশপাশের গ্রামে ঘটেছে তা ষষ্ঠীর অজানা নয়। অথচ ভূতেরা সব ভ্যানিশ।

বাবার কথা মনে পড়ল ষষ্ঠীর। তার বাবা ছিলেন বড় গুনিন। তিনি বলতেন, "শোন বাবা, অন্ধকার ছাড়া ভূত থাকে না। যে গাঁয়ে যত বনজঙ্গল, সে গাঁয়ে তত ভূতের বাস।"

তেনাদের বসবাসের জন্য ষষ্ঠীর বাবা বাড়ির চারপাশে কত গাছই না বসিয়েছিলেন। ষষ্ঠী ভাবল, বাবার কথাই সত্যি। এই বছর দশ আগেও গাঁয়ে কত গাছপালাই না ছিল। দিনেও আলো ঢুকত না অনেক জায়গায়। সেই সব ঝোপজঙ্গলের পাশ দিয়ে গেলেই লোকের হাওয়া বাতাস লাগত। আর আজ গাঁয়ে গাছপালার কী আকাল! ষষ্ঠী নিজেকে বোঝাল, তেনাদের থাকাথাকির মতো তেমন জায়গা নেই বলেই হয়তো সকলে একসঙ্গে গ্রাম ছেড়েছেন।

সেদিন দুপুরে দাওয়ায় বসে খাওয়ার সময় গাঁ ছাড়ার কথাটা ষষ্ঠী বলেই ফেলল গিন্নিকে, "শোনো, গাঁ না ছাড়লে টিকে থাকার আর তো উপায় দেখছিনে। তিন মাস হাতে কোনও কাজপত্তর নেই। গ্যাঁটের টাকাকড়ি যা ছিল তা তো প্রায় হাওয়া। এর পর হাওয়া খাওয়া ছাড়া আর কোনও গতি নেই দেখছি। এভাবে বসে না থেকে আমি বরং অন্য কোথাও গিয়ে দেখি কাজের কোনও ধান্দা করতে পারি কিনা।"

স্বামী দেশত্যাগী হবে শুনে ষষ্ঠীর গিন্নি প্রথমে একটু ভেঙে পড়ল। তাদের বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক হল। কাজের চাপে একটা সময় তার কর্তা নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত পেত না। এ জন্য মাঝে মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও লাগত তাদের মধ্যে। তবে কর্তার রোজগার আর হাতযশের খবরে তার বেশ গর্বও হত। এই শেষ ক' মাসে কীভাবে এমন ভাটা পড়ে গেল তাদের ভাগ্যে, তা সে ভেবে পেল না। সে হতাশার সুরেই ষষ্ঠীকে বললে, "তা হ্যাঁ গো, ভূতেদের সব হলটা কী? তারা গেল গেলই বা কোথায়? এমন আকাল তো আগে কখনও হয়নি।" তারপর একটু ভেবে নিয়ে সে আবার বললে, "বেশ মনে আছে, তোমরা শেষ ভূত ছাড়ানোর ডাক এসেছিল সাঁতরা বাড়ি থেকে, ওদের বাড়ির সেই কাকে যেন খগেনের বাবা তখন ভূত হয়ে ধরেছিল। তারপর থেকে তো গোটা এলাকায় ভূতের আর নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।"

ষষ্ঠী বলল, "নামগন্ধ থাকবে কী করে শুনি, বনজঙ্গল আছে দেশে? সব তো ফাঁকা। আলো আসছে হু হু করে। একটা কথা সব সময় খেয়াল রাখবে, আলোর দেশে ভূত ব্যবসা বাঁচে না। আমাদের ব্যবসা বনের দেশে যেমনটি চলবে, তেমনটি আর অন্য কোথাও চলবে না।"

হঠাৎ গিন্নি বললে, "আচ্ছা তোমার বোনাই যেখানে থাকে সেই কুমিরমারি না কী যেন, সে তো শুনেছি বনবাদাড়ের দেশ, তা সেখানে গেলেও তো তুমি পার, না কি?"

তার নিজের আত্মীয়ই যে বনজঙ্গলের দেশের লোক তা ষষ্ঠী যেন তালেগোলে ভুলেই গিয়েছিল। গিন্নির মুখে প্রস্তাবটা শুনে সে বলল, "মন্দ বলোনি তো! কুমিরমারিতে বোনাইদের বাড়ির পাশে যে নদী, তার ওপারেই তো অজগর বন। ওখান থেকেই সুন্দরবনের শুরু। ওদেশে ভূতের দাপাদাপি যে বেশ আছে তা বোনাইয়ের মুখে শুনেছি। ওখানে গেলে বেশ জমবে বলেই মনে হচ্ছে।"

বউয়ের কথা বেশ মনে ধরল ষষ্ঠীর। সে যেন মনে একটা আশার আলো দেখতে পেল বলে মনে হচ্ছে।

আরও দু'-তিনটে দিন গেল। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে বোনাইয়ের দেশে যাওয়াই ঠিক করে ফেলল ষষ্ঠী। মনে-মনে ভাবল যে কাজ জমে গেলে, ক'দিন পরে এসে বউকেও নিয়ে যাবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন বউকে রাখবে শ্বশুরবাড়িতে। বউও রাজি হল ষষ্ঠীর কথায়।

সেই কথামতো পরের দিন সকালে বউকে নিয়ে পাশের গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে রাখতে গেল ষষ্ঠী। শ্বশুরকে সব কথা খুলে বলল না সে। শুধু বলল, বোনাইয়ের বাড়ি অনেকদিন যাওয়া হয়নি, তাই ক'দিনের জন্য একটু ঘুরতে যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়িতে দুপুরের খাওয়া সেরে সন্ধের আগেই নিজের ঘরে ফিরে এল ষষ্ঠী। আসার সময় বউয়ের কাঁচুমাচু মুখটা দেখে তার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। বউ শুধু বলল, "সাবধানে থেকো।"

ফাঁকা ঘরে ফিরে ষষ্ঠীর মনে বেশ কষ্ট হতে লাগল। কাল সকালে যাত্রা। গোছগাছ সেরে নিতে ঘণ্টাতিনেক গেল। তারপর শ্যাওড়া গাছের নীচে খাটিয়ার উপর বসে ষষ্ঠী নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছিল। ব্যবসাটা যে এভাবে বসে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

সাতপাঁচ চিন্তা করছে, এমন সময় শ্যাওড়া গাছের উপর থেকে যেন পরপর দুটো হাঁচির আওয়াজ হল। ষষ্ঠী চমকে উঠে উপরের দিকে তাকিয়ে "কে রে," বলতেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে আওয়াজ ভেসে এল, "ষষ্ঠী ভয় পাসনে বাবা, আমি তোর

সিধুজ্যাঠা রে।"

সিধুজ্যাঠা হল তার মণ্ডলপাড়ার বন্ধু পরানের বাবা, বছরদুই আগে মারা গিয়েছেন। তাকে ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। ভয় পাওয়ার কথা শুনে হাসি পেলেও সেটা চেপে সে বলল," নিজের লোককে আবার ভয় কী জ্যাঠা, তা বলেন,

আপনি কেমন আছেন?"

সিধুজ্যাঠা বললেন, "আমার কথা পরে হবে, আগে তোর কথা বল দেখি, কী শুনছি এসব, তুই নাকি দেশান্তরী হচ্ছিস?"

ষষ্ঠী বলল, "ভিন দেশে যাওয়া ছাড়া উপায় কী বলেন তো, ভূতেরা যদি কাজ বন্ধ করে তা হলে ওঝার কী আর কাজ থাকে, এদেশে থাকলে উপোস করে মরা ছাড়া আর উপায় কী?"

সিধুজ্যাঠা বললেন, "উপায় আছে রে, উপায় আছে, মাথা গরম না করে যা বলি মন দিয়ে শোন। কালকে ওদেরকেও আমি একই কথা বলেছি, মাথা গরম কোরো না।"

"ওদেরকে মানে?" ষষ্ঠী অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

"মানে আমাদের জগতের সব কচিকাঁচাগুলোকে।"

ষষ্ঠী বলল, "তাদের আবার মাথা গরম কেন?"

"সে কথাই তো তোকে বলতে এসেছি, ওঝা হয়েছিস বলেই যে ভূতেদের সব খবর জেনে যাবি তা তো নয়। আমাদের নিয়মকানুনও তো দিনে-দিনে বদলাচ্ছে। এখন যা নিয়ম তাতে সদ্য হওয়া ভূত অন্তত তিনটে স্টার না পেলে তার কোনও মর্যাদা নেই ভূত সমাজে, সেটা পাওয়ার পরেই ভূতেদের রেজিস্টারে তার নাম ওঠে। তারপর বছরে একটা করে স্টার পেলেই চলবে।"

"স্টার পাওয়া, সেটা আবার কী?"

"হ্যাঁরে স্টার, বায়ু হয়ে ঢুকে একটা মানুষের শরীরে টানা তিনদিন জ্বালাতন করলে ওয়ান স্টার। এমনিভাবে তিনজনকে জ্বালাতন করে তবে তিনটে স্টার পাওয়া যায়। কিন্তু তোর জ্বালায় সব কচিকাঁচাদের সে উপায় আছে বাবা? ধর তারা কারও ঘাড়ে চাপল, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পেরতে না-পেরতেই তোর ডাক পড়ল সেখানে, আর তুই লঙ্কাপোড়া, সরষে পোড়া মেরে তার নাভিশ্বাস তুলে তাকে দেহ ছাড়তে বাধ্য করলি। আর সেই ভূতের স্টার পাওয়াও লাটে উঠল।"

ষষ্ঠী কিছুটা যেন বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা, সে বলল, "তাই আমার উপর সবার রাগ নাকি?"

সিধুজ্যাঠা বলল, "এই তো বেশ বুঝেছিস। সব ভূত মিলে তাই ঠিক করেছে যে স্টার পাওয়া যদি নাই হয়, তা হলে মানুষের দেহে ঢোকার হ্যাপা আর কেউ নেবে না। সকলে মিলে মানুষ ধরা বয়কট করেছে। আর তোর কাজেও নেমেছে আকাল।"

ষষ্ঠী বলল, "তা হলে আমায় আর আপনি আটকাচ্ছেন কেন জ্যাঠামশাই? আমি চলে গেলে আপনাদের তো ভালই হবে। যত খুশি স্টার পাবেন, সম্মান বাড়বে।"

"হিসেবটা অত সোজা নয় রে বাবা, ওঝার যেমন ভূতকে দরকার, ভূতেরও তেমনই ওঝাকে দরকার," সিধুজ্যাঠা বললেন।

এখন যা নিয়ম তাতে সদ্য হওয়া ভূত অন্তত তিনটে স্টার না পেলে তার কোনও মর্যাদা নেই ভূত সমাজে, সেটা পাওয়ার পরেই ভূতেদের রেজিস্টারে তার নাম ওঠে। তারপর বছরে একটা করে স্টার পেলেই চলবে।

"সেটা আবার কেমন কথা হল?" ষষ্ঠী বলল।

"ওরে শোন, নেহাত স্টার পাওয়ার নিয়মটা আছে বলেই ভূতে মানুষকে জ্বালাতে যায়, নয়তো অন্যের দেহে বায়ু হয়ে সেঁধিয়ে থাকা কি চাট্টিখানি কথা? তিনদিনে তিনশো অবস্থা হয়। কিন্তু তিনদিন পরেই তো আসল মজা। স্টার পাওয়া তো হল, তারপর মানুষের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা হল সবচেয়ে বড় সমস্যা, সেটি কিন্তু তার নিজের ইচ্ছেয় হবে না।"

"বলেন কী?" ষষ্ঠী অবাক হয়ে বলল, "নিজের ইচ্ছেয় ঢুকতে পারে অথচ বেরতে পারে না?"

সিধুজ্যাঠা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, সে এক বিরাট মজা। অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহ থেকে বেরবার কৌশল ভূতেরা জানে না। আর তখন ওঝা ছাড়া তাদের কোনও গতি নেই। তোরা সরষে, লঙ্কা পোড়ালে, তখন ভূতে পাওয়া লোক সজোরে ঘন-ঘন হাঁচি দেবে তখন সেই হাঁচির সঙ্গে ফুস করে ভূতের হাওয়া বেরবে বাইরে।"

এবার ষষ্ঠীর মুখে হাসি ফুটল। এতক্ষণে তার করণীয় কাজটি সে বেশ বুঝেছে, স্টার পাওয়ার ব্যাপারে ভূতেদের তার সাহায্যের দরকার। সে বলল, "তা হলে ভূতে ধরা কেসের চিকিৎসার তিনদিনের আগে শুরু করা চলবে না, এই তো তাদের দাবি?"

সিধুজ্যাঠা বললেন, "সে আবার কী কথা? চিকিৎসা শুরু করবি না কেন? তোর পেশা ওটা, তুই প্রথমদিন থেকেই চিকিৎসা শুরু কর। অং বং যত পারিস মন্ত্র বল, কোনও ক্ষতি নেই। শুধু সরষে আর লঙ্কা পোড়াটা তিনদিনের আগে মারিস না বাবা, এটাই আমাদের তরফ থেকে তোর কাছে একমাত্র অনুরোধ। না হলে, আমাদের কচিকাঁচারা যে কাতে পড়ে যাবে বাবা।"

ষষ্ঠী লজ্জা পেয়ে বলল, "আপনাকে কথা দিলাম জ্যাঠামশাই, তিনদিনের আগে লঙ্কা, সরষে আর কক্ষনও পুড়বে না।"

সিধুজ্যাঠা বলল, "এই হল লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা। এবার আমার কথা শোন, ভিনদেশে যাওয়ার জন্য বাঁধাছাদা যা সব করেছিস, সব এক্ষুনি খুলে ফেল, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরিয়ে আন। বাপ-ঠাকুরদার ভিটে কী আর ত্যাগ করতে আছে বাবা, ও যে মহাপাপ।"

ষষ্ঠী তখন বলল, "সে নয় হবে জ্যাঠামশাই, কিন্তু ওদিকে স্ট্রাইক উঠবে তো?"

"উঠবে মানে, উঠে বসে আছে, ওঝা সাহস দিলে, ভূতেদের আর ভয় কী? কথা দিচ্ছি, কালই তিনটে কেস পাবি। এবার আসি বাবা, ওরা আবার আমাদের এই মিটিংয়ের খবর জানবে বলে হা পিত্যেস করে বসে আছে," বলতে-বলতে হো হো করে হেসে উঠল সিধুজ্যাঠা।

ষষ্ঠীর মুখেও এক গাল হাসি, আনন্দের চোটে তার একটু নেচে নিতেও ইচ্ছে করছে।

সিধুজ্যাঠা চলে যেতে সে মৌজ করে গুছিয়ে বসল।

ছবি: কুনাল বর্মণ

১		২	■	৩		■	৪
	■	৫	৬		■	৭	
৮	৯	■	১০		■	১১	
■	১২	১৩		■	১৪	■	
১৫	■		■	১৬		১৭	■
১৮	১৯	■	২০		■	২১	২২
২৩		■	২৪		২৫	■	
	■	২৬		■	২৭		

পা শা পা শি

১। সিঁড়ি।
৩। শত্রু।
৫। মণিমাণিক্য।
৭। বৃষ্টি পড়লে রাস্তায় যা হয়।
৮। সবসময়।
১০। মুহূর্ত।
১১। শরৎকালে মাঠেঘাটে ফুটে থাকে।
১২। শ্মশান।
১৬। শোওয়া।
১৮। খেলায় তো ___জিত থাকবেই।
২০। এখন, এবার।
২১। যথেষ্ট হয়েছে বা নিঃশেষিত অর্থে ব্যবহার হয় অব্যয়টি।
২৩। নিচু হওয়া।
২৪। প্রথম, সর্বাতীত, চরম স্ত্রীলিঙ্গে।
২৬। শুল্ক, হাত।
২৭। পরের জন্য।

উপর-নীচ

১। আনন্দের সঙ্গে।
২। মানুষ।
৩। আগুন।
৪। সজ্জন।
৬। সূর্য।
৯। মূল্য।
১৩। ___সবজি।
১৪। মহাভারতে যে দানব পাণ্ডবদের আশ্চর্য প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছিল।
১৫। ওড়িশার প্রধান নদী।
১৬। ব্যাধ।
১৭। নতুন।
১৯। ব্যাপৃত।
২০। অন্য।
২২। সহপাঠী।

গত সংখ্যার সমাধান

সা	গ	র	■	পা	র	■	হ
হা	ত	■	ক	ল	ম	■	র
রা	■	ফে	রা	■	■	শী	ত
■	নি	র	ত	■	চ	ল	ন
খ	পা	ত	■	গ	ড়	ন	■
র	ত	■	■	র	ক	■	ক
বা	■	বা	চা	ল	■	ক	ম
য়ু	■	সা	র	■	ত	ব	লা

শালুক

নিজের হাতে

বানাও কাগুজে বিড়ালের মুখ

উপকরণ: চৌকো সাদা কাগজ, টিপ ও স্কেচপেন।

কীভাবে করবে: খুব সহজে সামান্য জিনিসে একটা বিড়াল বানানোর কৌশল শিখে রাখো। একটা চৌকো সাদা কাগজকে কোনাকুনি সমানভাবে ভাঁজ করো। দ্যাখো, এভাবে তোমরা একটা ত্রিভুজ পেয়ে যাবে। এবার ত্রিভুজের ভূমির মাঝবিন্দু থেকে ডান-বাম দুই প্রান্তকে উপর দিকে মুড়ে দাও। তারপর ত্রিভুজের মাথার প্রান্তটি নীচের দিকে মুড়ে দাও। মুড়ে দেওয়া দিকের বিপরীতে দেখো, বিড়ালের মুখের আদল পেয়ে যাবে। শেষে টিপ দিয়ে দু'টি চোখ আর স্কেচপেন দিয়ে নাক ও ঠোঁট এঁকে দিলেই তৈরি বিড়ালের মুখ। গোঁফ দিতে ভুলো না।

গুরুপ্রসাদ দে
ফোটো: প্রদীপ আদক

পিংলাটুলির ইউ এফ ও

শ্যামল দত্ত চৌধুরী

*(**আগে যা ঘটেছে** : লক্ষ্মীপুজোর পরদিন সবাই বাড়ির অনুমতি নিয়ে মৈনাকদার সঙ্গে এক্সকারশনে বেরিয়ে পড়ল। বারোজনের দল যাবে প্রথমে বোলপুর। সেখান থেকে ট্রেকারে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে পিংলাটুলি গ্রামে। ট্রেনেও যথারীতি ইউ এফ ও নিয়ে কথা হচ্ছিল। তোড়া জানাল পিংলাটুলিতে নাকি পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ইউ এফ ও দেখা গিয়েছিল। ওই কথার জেরে এডুয়ার্ড মেয়ারের সঙ্গে ভিনগ্রহীদের যোগাযোগের কথাও উঠল। এইভাবে ট্রেন জার্নি চলছিল।)*

ট্রেনের গতি কমছে, বোধ হয় স্টেশন আসছে কোনও। গুসকরা। অভ্র আর আমি প্ল্যাটফর্মে নামলাম। ওদিকের লাইনে কী যেন একটা লোকাল দাঁড়িয়ে আছে। কিছু লোক এদিক-সেদিক দিগভ্রান্তের মতো ঘুরছে। অভ্র বলল, "কী খাওয়া যায়! তেমন পুষ্টিকর কিছু তো চোখে পড়ছে না।"

একটা লোক হঠাৎ বলল, "সস্তায় কলা খাবে? বাই ওয়ান গেট টু ফ্রি।"

আরে, এই তো সেই লোকটা, অদ্ভুত পোশাক পরে যে বর্ধমানে আমাকে কলা খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করছিল। ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে বলেছিল।

আমি বললাম, "দাদা, ট্রেনটাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলাম, কিন্তু কথা শুনল না। ছেড়ে চলে গেল, সরি।"

"সস্তায় কলা খাবে?"

"বাহ, তখন যে ফ্রি দিতে চেয়েছিলে? আমার এই বন্ধু ফ্রি পেলে দু'ডজন খেতে পারে।"

লোকটা কলা গুনতে লাগল। লোকটার হাতের

আঙুলের মাঝে কোনও ফাঁক নেই, পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। ক্রিকেটে উইকেটকিপারের গ্লাভ্‌সে যেমন ওয়্যারিং থাকে, সেই রকম ওর দুটো হাতের তালু। হাঁসদের পা যেমন হয়, তেমনই দেখতে।

বিনে পয়সায় কলা পেয়ে অভ্র খুব খুশি। আমাকে উদারভাবে বলল, "অমিতাভ, ওই চায়ের স্টলটায় বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছে। তুই খেয়ে আয়, আমি পয়সা দেব।"

এমন সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। আমি অনেক বিস্কুট পকেটে ভরে পিছনে অভ্রর দিকে তাকিয়ে দেখি, কেউ নেই। না অভ্র, না সেই বিদঘুটে কলাওয়ালা। অভ্র কি তা হলে আমাকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে ট্রেনে উঠে পড়েছে! আমাদের কামরাটা ছাড়িয়ে একটু দূরেই এসে পড়েছি। চারদিকে তাকালাম, কোথায় গেল অভ্র? এদিকে চায়ের দোকানদার সন্দিগ্ধ চোখে বিস্কুটের দাম চাইছে। বিস্কুট ফেরত দিতে-দিতে তার কিছু খারাপ মন্তব্য আমাকে মাথা নিচু করে হজম করতে হল।

পাশে একটা টেলিফোন বুথ। দরজা বন্ধ, বাইরে একটা কুকুর পরিত্রাহি ডাকছে। কাচের ভিতর দিয়ে বুথে একজন লোক দেখা যাচ্ছে। আরে, সেই লোকটা তো, যে সস্তায় কলা বেচতে এসেছিল !বোধ হয় কুকুর তাড়া করেছিল, ভয়ে বুথে ঢুকে দরজা টেনে দিয়েছে। হতাশ কুকুরটা প্রাণপণে ডেকে চলেছে। কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি বুথের দরজা ফাঁক করে বললাম, "এই যে, আমার বন্ধু কোথায়?"

সে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে নেমে যেতে-যেতে বলল, "ক্যাপ্টেন স্‌ফ্যাথ ওকে নিয়ে গিয়েছে। আরও কলা খাওয়াবে। চিন্তা কোরো না। বোলপুরে ফেরত পেয়ে যাবে ওকে। আসলে আমাদের দরকার মৈনাক সামন্তকে।"

লোকটার চলন পিছন থেকে অবিকল হাঁসের মতো। ওর পায়ের আঙুলও বোধ হয় পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। সে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে লাইন পেরিয়ে চলে গেল। এদিকে আমাদের ট্রেনও দুলে উঠেছে। কী করব, ভেবে না পেয়ে আমি সামনের একটা কামরায় উঠে পড়লাম। গোটাচারেক কামরা পার হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বন্ধুদের কাছে পৌঁছে বললাম, "সর্বনাশ! অভ্রকে কিডন্যাপ করেছে। ওকে পুষ্টিকর ফ্রি কলার লোভ দেখিয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছে।"

তোড়া আঁতকে উঠে বলল, "কী আবোল-তাবোল বকছিস? অভ্র কোথায়?".

অগ্নি সোহম লাফিয়ে উঠে বলল, "চল শিগগির, কোথায় অভ্র?"

কেবল মৈনাকদা শান্ত গলায় বলল, "উত্তেজিত হওয়ার সময় পড়ে আছে। অমিতাভ, এখানে বসে সবিস্তারে ঘটনাটা বল।"

আমি হড়বড় করে বলতে গিয়ে আগে-পরে গুলিয়ে

ফেলছিলাম, মৈনাকদাই প্রশ্ন করে-করে সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ জেনে নিল। লোকটার সঙ্গে আমার বর্ধমান স্টেশনে দেখা হওয়ার পর থেকে সব বললাম, তার অদ্ভুত চেহারা আর পোশাকের কথাও বললাম।

মৈনাকদা কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, "ওরা আমাকেই খুঁজছে। মনে হয় বর্ধমান স্টেশনে অমিতাভ জানলা দিয়ে অভ্রকে কলা অফার করার সময়, লোকটা খবরের কাগজের আড়ালে আমাকে দেখে ফেলেছিল। না রে, অভ্রর কোনও ভয় নেই, যেমন বলেছে অভ্রকে বোলপুরে ফেরত পাওয়া যাবে। অভ্রকে ওরা ধরেছে ইনশিওরেন্স হিসেবে, আমাকে কোনও বিশেষ বার্তা পাঠাতে চায়। আমাকে চাপে রাখছে ওরা।"

আমরা বলে উঠলাম, "ওরা মানে! তুমি ওদের চেন নাকি?"

গোঁফে মোচড় দিয়ে মৈনাকদা নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে বসে রইল। ঘুমিয়েই পড়ল বোধ হয়। আমাদের আড়াইশো প্রশ্নের কোনও জবাবই দিল না!

কী আর করা! কিছুক্ষণ আমরা বোকার মতো এ-ওর মুখের দিকে তাকালাম।

একটু পরে তোড়া বলল, "মৈনাকদা যখন ভরসা দিচ্ছে, বলছে অভ্রর কোনও ভয় নেই তখন। সোহম, তুই বরং এডুয়ার্ড মেয়ারের গল্প বল।"

মৈনাকদার উপরে আমাদের সকলেরই রাগ হচ্ছে। অভ্র নিরুদ্দেশ, অথচ এমন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়! টেনশন হয় না? মৈনাকদার যেন কোনও দুশ্চিন্তাই নেই, দিব্যি চোখ বন্ধ করে ঢুলছে। কিংবা আমাদের প্রশ্ন এড়াবার জন্য ঘুমের ভান করছে।

মৈনাকদার উপরে আমাদের সকলেরই রাগ হচ্ছে। অভ্র নিরুদ্দেশ, অথচ এমন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়! টেনশন হয় না? মৈনাকদার যেন কোনও দুশ্চিন্তাই নেই, দিব্যি চোখ বন্ধ করে ঢুলছে। কিংবা আমাদের প্রশ্ন এড়াবার জন্য ঘুমের ভান করছে।

মৈনাকদাকে খোঁচা দেওয়ার জন্য অগ্নি বলল, "সোহম, পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে যাওয়ার জন্য জাপানের অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণকেই স্ফ্যাথ দায়ী করেছিলেন। কলকাতায় এসে মেয়ার কী সেসব ইমপর্ট্যান্ট কথাবার্তা আলোচনা করার জন্যই মৈনাকদাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?"

তোড়া বলল, "এডুয়ার্ড মেয়ার স্বয়ং এসেছিলেন আমাদের পাড়ায়। ভাবা যায় না। ওয়াও!"

মৈনাকদাকে নিরুত্তর দেখে অগ্নি কৌতুকের স্বরে বলল, "সোহম, আমার মনে হয় মৈনাকদার ছোটকাকা নিশ্চয়ই ক্লাইমেট চেঞ্জ আটকাবার উপায় বলে দিয়েছিলেন মেয়ারকে।"

মৈনাকদার একটা চোখ খুলল। নিচু গলায় বলল, "মেয়ার কথাটা তুলেছিলেন বটে। সব দোষ তো আর সে বেচারার নয় রে, ওঁকে ভুলভাল বুঝিয়েছিল সেই বুড়ো ই টি স্ফ্যাথ। আমার ছোটকাকা সতর্ক করে দিয়েছিলেন মেয়ারকে।"

ফের চোখ বুজে ফেলল মৈনাকদা। কেবল ট্রেনের চাকার শব্দ আমাদের দুলিয়ে চলেছে। মৈনাকদা চুপ। কিছুতেই তাকে গল্পে জড়ানো যাচ্ছে না, অথচ হাবভাব রহস্যজনক।

অগ্নি একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "না সোহম, উইকেটে স্পিন ধরছে না। ডেড অ্যাজ় এ ডোডো..."

মেয়ারের রোমাঞ্চকর কাহিনি শোনার জন্য তোড়া ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। সোহমের গল্পে বাধা পড়াতে ও বেশ বিরক্ত। বলল, "একলা অগ্নিকে ওই হার্ডকপি দিয়েছিস কেন রে সোহম? ও জানে বলে বারবার মেয়ারের গল্পে বাগড়া দিচ্ছে।"

সাধারণত মৈনাকদা একাই মাইক দখল করে রাখে, অন্য কাউকে কথা বলার অবকাশ দেয় না। আজ পিকচার কিছু আলাদা। মেয়ারের সাবজেক্টে সোহম দারুণ ফর্মে খেলছে, টিমের হয়ে একলাই ব্যাট ক্যারি করছে। বেগতিক দেখে মৈনাকদা ঝিমোচ্ছে।

তোড়া বলল, "হলিউডের সিনেমায় কিম্ভূত সব ই টি-র দেখা পাওয়া যায়। মেয়ার কি তেমনি কোনও প্রাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন?"

কিছুক্ষণ ধরে একটা ভাবনা আমার মাথায় ঘুরছিল। বললাম, "মেয়ারের পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে যেন মায়া মনে হচ্ছে ইলিউশন। পাঁচ বছরের শিশু মেয়ার যে আবহাওয়া-বদলের তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিল, সেটাই কেমন সন্দেহজনক!"

সোহম বলল, "স্ফ্যাথ একদিনে তো আর সমস্ত কথা মেয়ারকে বলেননি রে পটলচাঁদ! নানা বিষয়ে মেয়ার তাঁর কাছে এগারো বছর শিক্ষালাভ করেছিলেন। যেসব কথা স্কুলের সিলেবাসে নেই তাতেও মেয়ারের জ্ঞানের বহর দেখে শিক্ষকরা অবাক হয়ে যেতেন। তাঁরা বলতেন, তুমি এমন সব দুরূহ বিষয় জানলে কী করে? তাঁরা তো আর জানত না যে, বালক মেয়ারের এমন এক মহাজ্ঞানী প্রাইভেট টিউটর আছে যে এই জগৎ এবং মহাবিশ্বের অনেক গভীর রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল!

"ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত মেয়ারের যোগাযোগ ছিল স্ফ্যাথের সঙ্গে। তারপর তার মেয়াদ শেষ, স্ফ্যাথ বিদায় নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন তার নিজের নক্ষত্রলোকে।

"তিনি বিদায় নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে অন্য এক নক্ষত্রলোকের ই টি মেয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। একটি অল্পবয়সি হাসিখুশি মেয়ে, নাম তার আসকেট। সে এসেছিল এমন এক লোক থেকে, যেটা স্ফ্যাথের গ্রহ থেকেও একশো ছিয়াত্তর কোটি আলোকবর্ষ দূরে! মেয়েটার মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল, লম্বায় পাঁচ ফুটের মতো সে। আমাদের পৃথিবীতে তখন ১৯৫৩ সাল।"

অগ্নি বলল, "যাক বাবা, সব ই টি তা হলে হলিউডের ই টি-দের মতো নয়। ওদের ব্যাঙের মতো মুখ, সরু-সরু হাত-পা দেখলে আমার অমিতাভর কথা মনে পড়ে যায়।"

আমি বললাম, "আমরা গেলে ওই আসকেটের গ্রহতেই যাব, অগ্নিকে বরং স্ফ্যাথের গ্রহ পর্যন্ত লিফট দেওয়া যাবে।"

তোড়া রেগেমেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সেই তখন থেকে অগ্নি আর অমিতাভ বাজে কথা বলছে। সোহম, চেন টেনে ওদের পিচকুড়ির ঢালে ফেলে দিই চল।"

সোহম বলতে লাগল, "তারপর শোন, আসকেট ইউ

এফ ও-তে মেয়ারকে তুলে নিয়ে পৃথিবীর চুয়াল্লিশটা দেশ ভ্রমণ করেছিল। তার কাছেও মেয়ার এগারো বছর শিক্ষালাভ করেছিলেন, শেষে ১৯৬৪ সালে এই ভারত থেকেই মহাকাশযান উড়িয়ে আসকেট ফিরে গিয়েছিল তার নক্ষত্রলোকে।

"আসকেটের নির্দেশে মেয়ার তারপর তাঁর অভিজ্ঞতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এই স্মৃতিকথা লেখার কাজ চলেছিল এগারো বছর। ক্রমশ দু'শো পাতার চোদ্দোটা খণ্ড লিখে ফেলেছিলেন মেয়ার। নাম তার 'কনট্যাক্ট নোটস'।

"আবার ১৯৭৫ সালে ভিনগ্রহের একটি মেয়ে জুরিখে মেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তার নাম সেমিয়াস, উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, মাথায় সোনালি চুল। সে ছিল বুড়ো স্ফ্যাথের নাতনি। ইউ এফ ও উড়ানের অসংখ্য স্টিল ফোটো আর ভিডিয়ো ফিল্ম তুলতে মেয়ারকে সাহায্য করেছিল সেমিয়াস।

"পৃথিবীর জনসংখ্যা ব্যাপক বেড়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল সেমিয়াস। মেয়ারের 'ওভার পপুলেশন' বইটা তাই নিয়েই লেখা। সেমিয়াসের কম্পিউটারে দু'হাজার বছরের ডেটা, সেই রোমের আমল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পরিসংখ্যান। তাই দেখে মেয়ারের চক্ষু মনুমেন্টে! কী মারাত্মক ভীতিকর অবস্থা? পৃথিবীর বহন ও ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মানুষ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

"যেহেতু আমাদের পৃথিবীর আয়তন সীমিত, তার অন্ন-উৎপাদন ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সেমিয়াসের হিসেব অনুসারে বসুন্ধরা টোটাল ৫২৯০০০০০০ জনের বেশি মানুষ প্রতিপালন করতে অক্ষম। অত্যধিক জনসংখ্যা তাই আমাদের গ্রহকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।"

কয়েক মিনিট ধরে ট্রেনের গতি ধীরে-ধীরে কমে আসছিল। একসময় একদম থেমেই গেল। একটু আগে একজন বাউল টং টং একতারা বাজিয়ে আমাদের কামরায় নেচে-নেচে গান গেয়ে গিয়েছেন:

"গাড়ি চলেছে আজব কলে /এ দেহ দিয়ে মাটি পরিপাটি/ আগুন জল আর হাওয়ার বলে/ হৃদয় স্টেশনে চেপে সুদ মহাজনে/ চালায় কল রাত্রিদিনে যেখানে মন যায় চলে/ কুলকুণ্ডলিনী মহারানি বিরাজ করেন চর্তুদলে..."

আমি তো গানের মাথামুন্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না, যদিও কামরার একজন বয়স্ক ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে কাশছিলেন। আমাদের দলটাকে দেখে বাউল বুঝেই গিয়েছিলেন এরা কেউ গান শুনে খুশি হয়ে দক্ষিণা দেওয়ার পাত্র নয়। তাড়াতাড়ি পার হয়ে তিনি পাশের কামরায় চলে গেলেন।

অগ্নি বলল, "বাউল বোধ হয় লোকাল লোক, ট্রেন হঠাৎ থেমে গেল কেন নিশ্চয়ই বলতে পারবেন..."

তোড়া বলল, "যা না তুই জিজ্ঞেস করে আয়, বেশি দূরে যাননি এখনও।"

অগ্নি কথা বলে ফিরে এসে বলল, "বাউল বলেছেন, এটা সামান্য ব্যাপার। ক'দিন পরে-পরে কিছু লোক নাকি লাইনে বসে পড়ে। এই রুটে ট্রেন লেট চলে, তার প্রতিবাদ, অবরোধ।"

তোড়া অবাক হয়ে বলল, "অবরোধ করলে তো আরও লেট চলবে!"

"বাউল বলেছেন, বেশ অনেকক্ষণ বন্ধ থাকবে ট্রেন। যাত্রীদের ব্যাপক হয়রানি হবে। এটাই নিয়ম। বাউল সব জানেন। তারপর তিনি একটা কঠিন গান ধরলেন, মানে বুঝতে না পেরে আমি চলে এলাম।"

তোড়া অসহায় চোখে মৈনাকদার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হবে মৈনাকদা? ওদিকে কিডন্যাপাররা অভ্রকে নিয়ে অপেক্ষা করবে বোলপুরে। আমাদের দেরি দেখে যদি ...মৈনাকদা, পুলিশে খবর দেবে নাকি?"

সোহম বলল, "একেই ট্রেন লেট চলছে, তার উপর অবরোধ। বোধ হয় বোলপুর স্টেশন খুব একটা দূরে নয়, রেললাইন ধরে চললে আমরা..."

মৈনাকদা চোখ খুলে সহজ গলাতেই বলল, "তোদের খিদে পাচ্ছে না? বোলপুরে নেমে লাঞ্চপ্যাকেট খোলার প্ল্যান ছিল, বরং ট্রেনেই সেরে ফেলা যাক। আজ রাতে আমার পৌঁছতেই হবে পিংলাটুলি। অনেকে অপেক্ষা করছে। অবশ্য দুটো জিপ অনলাইন বুক করাই আছে, আমাদের দেরি হলেও ওরা থাকবে বোলপুর স্টেশনে।"

তোড়া বলল, "আমরা কোথায় অভ্রর জন্য ভেবে-ভেবে মরছি, আর মৈনাকদা, তুমি কিনা খাওয়ার কথা ভাবছ! অভ্রর মা-বাবাকে কী জবাব দেব আমরা?"

মৈনাকদা বিরক্ত হয়ে বলল, "তোদের তো বলেইছি, অভ্রর কোনও ভয় নেই। ওকে বোলপুরে না পাই পিংলাটুলিতে ঠিক পেয়ে যাব। হানড্রেড পার্সেন্ট। তোরা খামোকা মাথায় চাপ নিচ্ছিস কেন?"

মৈনাকদা উঠে খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গেল আমাদের দলের কয়েকজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে। সকলের হাতে-হাতে প্যাকেট দেওয়া ওদেরই দায়িত্ব।

মৈনাকদা যতই কিছুই হয়নি ভাব দেখাক, আমরা কিন্তু অভ্রর জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। মৈনাকদা এমন নির্লিপ্ত আছে কী করে, তাই ভেবে আশ্চর্য লাগছে। আমরা চারজন আর মৈনাকদা ছাড়া কেউ এখনও অভ্রর কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারটা জানে না। এর মধ্যে কয়েকবার আমাদের দলেরই দু'-একজন এসে অভ্রর খোঁজ করে গিয়েছে। আমরা বলেছি, অভ্র বোর হয়ে বাউলের সঙ্গে অন্য কামরায় নেচে-নেচে ডুয়েট গান করতে গিয়েছে।

আমার মন দারুণ ভারাক্রান্ত। আমার সামনেই কিনা অভ্র নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! তারপর সেমিয়াসের কাছে মেয়ার পৃথিবীর ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা যা শুনেছিলেন, সেই ছবি আমাকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল। ওভার পপুলেশন কী ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে! সোহমের কথা শুনতে-শুনতে আমার মনে একটা গুমট, থমথমে ভাব চেপে বসছিল।

আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, আমাদের পৃথিবী নামে গোলকটার গা বেয়ে-বেয়ে পিঁপড়ের মতো মানুষের ভিড়। একবার আমাদের স্কুলের কাছে এক খোলা মিষ্টির দোকানে দেখেছিলাম একটা বিরাট রাজভোগের গায়ে কালো-কালো পিঁপড়ে ছেয়ে ফেলেছে। পৃথিবীটাকে যেন তেমনই দেখাচ্ছে। মানুষজন তাড়াতাড়ি এ-ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে পিলপিল করে যাতায়াত

করছে। আমার শরীর ভয়ে ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

আমরা লাঞ্চের প্যাকেট হাতে পেয়ে সেদিকে মন দিলাম। একটু পরে মৈনাকদা এসে তাচ্ছিল্যভরে বলল, "যেমন ওই বুড়ো স্ফ্যাথ তেমনই তার নাতনি সেমিয়াস! অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। আর এডুয়ার্ড মেয়ারটা তো এক আস্ত হাঁদাগঙ্গারাম যা বোঝায় তাই বোঝে।"

কিন্তু ই টি আর মেয়ারের এনকাউন্টার দারুণ প্রভাব ফেলেছে তোড়ার মনে। মৈনাকদাকে শুনিয়ে বলে উঠল, "ওয়াও! এডুয়ার্ড ক্যালবার্ট মেয়ার একজন সত্যিকারের হিরো। আকাশে ইউ এফ ও-র আলো দেখেছে এমন তো কত লোকই আছে, কিন্তু ই টি-দের সঙ্গে মেলামেশা! মেয়ার বছরের পর-বছর সামনে বসে শিক্ষালাভ করেছেন, ভাবা যায়?"

অগ্নি বলল, "মেয়ার লিখেছেন সুইটজারল্যান্ডের পাহাড়ে তিনি হাড়কাঁপানো শীতে দিনের পর-দিন ইউ এফ ও-র অজস্র ফোটো তুলেছেন। মুভি তুলেছিলেন রিলের পর-রিল। ১৯৫৬ সালের সাতই ফেব্রুয়ারি কালো চুলের আসকেট তাঁকে বলেছিল, 'মনে রেখো, যা সত্য তা সব কালেই সত্য।' ইশ আমার যদি দেখা হয় আসকেটের সঙ্গে!"

আমি বললাম, "সোনালি চুলের সেমিয়াস বা মন্দ কী! হাইটও বেশ ঠিকঠাক।"

অগ্নি বলল, "মেয়ার নিজেই লিখেছেন তিনি কিছুদিন ভারতে ইন্দিরা গাঁধীর দেহরক্ষক ছিলেন। সোহম, তবে কি তিনি সত্যিই মৈনাকদাদের বাড়ি এসেছিলেন? পুরো ব্যাপারটা মৈনাকদা যে কিছুতেই গুছিয়ে বলছে না রে!"

সোহম বলল, "মেয়ারের সুইটজারল্যান্ডের ঠিকানা আছে ফিগুর ওয়েবসাইটে। আমি একদিন ঠিক মেয়ারের তোলা সমস্ত ফোটো আর ফিল্ম দেখে আসব। ওঁকে ধরলে নিশ্চয়ই ইউ এফ ও-তে একটা লিফ্‌ট পাওয়া যাবে।"

আমি বললাম, "তোড়ার জেঠু বলেছেন পিংলাটুলিতে নাকি একবার ইউ এফ ও নেমেছিল। তখন জানলে দেখে আসতাম, কে পাইলট আসকেট না সেমিয়াম।"

তোড়া বলল, "সে তো পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা! তখন তুই কোথায় ছিলি কেউ জানে?"

অগ্নি বলল, "আমি জানি। তখন অমিতাভ সবে গাছ থেকে মাটিতে নেমে দু'পায়ে হাঁটা আরম্ভ করেছে তারপর এই ওর প্রথম মানুষ জন্ম।"

তোড়া বোকার মতো হি-হি করে হেসে বলল, "অমিতাভর সঙ্গে দেখা করতে বয়েই গিয়েছে আসকেট আর সেমিয়াসের! যদি সত্যিই কোনও ই টি-কে অমিতাভ দেখতে পায়, তিনি হবেন স্ফ্যাথ, থুড়থুড়ে বুড়ো।"

তোড়ার কথাবার্তা খুবই বোকার মতো, আজ আবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। আমি যথাসাধ্য শীতল গলায় বললাম, "সেই স্ফ্যাথ কি আর বেঁচে আছেন? ১৯৪২-এই তো শুনলাম তার নব্বই বছর বয়স।"

সোহম স্বপ্নালু গলায় বলল, "মনে হয় স্ফ্যাথ সত্যিই হয়তো মারা গিয়েছেন। যখন মেয়ারের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে চলে যান, তখনই তিনি খুব বৃদ্ধ আর ক্লান্ত। বহু আলোকবর্ষ দূরত্বের কোনও নক্ষত্রমণ্ডলের কোনও এক নগণ্য কিন্তু অত্যন্ত সুসভ্য গ্রহে বোধ হয় স্ফ্যাথের সমাধিফলকে তার বংশধর আজ সশ্রদ্ধ ফুল নিবেদন করছে, কে জানে?"

পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। অগ্নি বলল, "আমেন।"

মৈনাকদা এসে বলল, "বাউল বলছে, অবরোধ ওঠার সময় হয়েছে, এবার ট্রেন আবার চলবে। আচ্ছা অমিতাভ, যে অদ্ভুত লোকটাকে কুকুর ফোন বুথে ঘেরাও করে রেখেছিল, সে কী বলেছিল তোকে? ওরা কি অভ্রকে বোলপুরে ফেরত দেবে, মানে, বোলপুর স্টেশনে?"

আমি ভাবতে-ভাবতে বললাম, "ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় বলেছিল বোলপুরে ফেরত দেবে। স্টেশন বলেছিল কিনা মনে নেই। আর বলেছিল, আমাদের দরকার তোমাদের মৈনাক সামন্তকে।"

মৈনাকদা গম্ভীর হয়ে বলল, "ওর ক্যাপ্টেনের নামটা আর-একবার বল তো?

"শুনতে লেগেছিল যেন স্ম্যাথ, পদবি নেই..."

মৈনাকদা বলল, "হুম।"

কিন্তু ই টি আর মেয়ারের এনকাউন্টার দারুণ প্রভাব ফেলেছে তোড়ার মনে। মৈনাকদাকে শুনিয়ে বলে উঠল, "ওয়াও! এডুয়ার্ড ক্যালবার্ট মেয়ার একজন সত্যিকারের হিরো। আকাশে ইউ এফ ও-র আলো দেখেছে এমন তো কত লোকই আছে, কিন্তু ই টি-দের সঙ্গে মেলামেশা!

তবু বোলপুর স্টেশনে ট্রেন ঢোকার সময় আমরা কামরার জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে আচ্ছা করে নজরদারি চালালাম। যদি অভ্রকে দেখতে পাওয়া যায়! ওরা বোধ হয় অভ্রকে গাড়িতে নিয়ে গিয়েছে, আমাদের ট্রেনে যে নেই তা আমরা আগেই খুঁজে দেখে নিয়েছি। প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। প্রচুর লোকে শান্তিনিকেতন বেড়াতে এসেছে। বেশ কিছুদিন অশান্তি চলবে এখানে।

আমরা চারজন মৈনাকদার সঙ্গে একটা গাড়িতে যাব। বাকিরা যাবে অন্য জিপটায়। ওদের এখনও অভ্রর কিডন্যাপিং-য়ের কথা জানাইনি। আমরা প্ল্যাটফর্মের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো তন্নতন্ন করে খুঁজে বাইরে এসেছি। অভ্র একদম বেপাত্তা।

বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে। মৈনাকদা অন্য গাড়িটাকে রওনা করিয়ে দিয়ে এসে বলল, "ড্রাইভার বলছে পুজোর আগে লাগাতার বৃষ্টিতে রাস্তার বেহাল অবস্থা। বারো-তেরো কিলোমিটার দূরে একটা কালভার্ট ধসে গিয়েছে। অনেকটা ঘুরে যেতে হবে পিংলাটুলি। পাক্কা তিন ঘণ্টা লাগবে।"

রাস্তায় গিজগিজ করছে ভিড়। আবার আমার সেই রাজভোগের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। রাশি-রাশি কালো পিঁপড়েয় আচ্ছন্ন। যানবাহন, মানুষ, টোটোয় ঠাসা। সব কিছুর মতো পৃথিবীরও তো নিশ্চয়ই একটা ধারণ-ক্ষমতা আছে! ক্রিটিক্যাল লিমিট লঙ্ঘন করলে ধ্বংস অনিবার্য, তাই না?

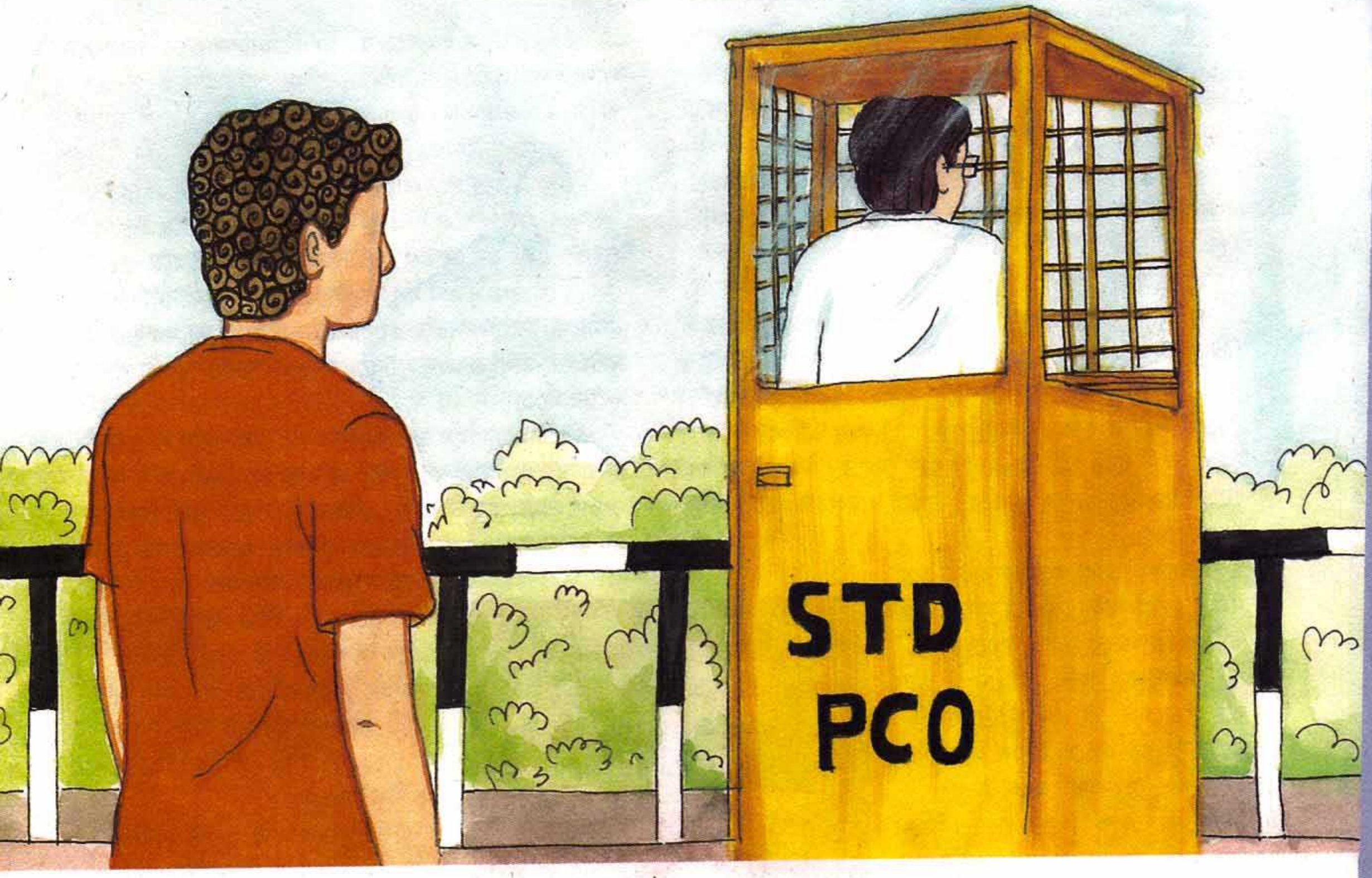

সোহম বলল, "অভ্রর কিডন্যাপারদের কেমন অদ্ভুত জীব লাগছে না? হাঁস আর মানুষের মিকশ্চার 'হাঁসুষ'। তোদের কি মনে হয় অমিতাভ সত্যি কথা বলছে?"

তোড়া বলল, "সবজান্তা পটলচাঁদের খুব একটা যুধিষ্ঠির বলে খ্যাতি নেই। সবাই বলে ওর কল্পনাশক্তি খুব উর্বর।"

অগ্নি বলল, "ঠিক বলেছিস। তার উপর স্ম্যাথ! ওরকম বিদঘুটে নাম কারও হয়?"

আমি রাগ করে বললাম, "কেন হবে না! এডুয়ার্ড মেয়ারের সঙ্গে স্ফ্যাথের দেখা হতে পারে, আর আমি কী দোষ করলাম! সম্যাথ হয়তো স্ফ্যাথের কোনও নিকট আত্মীয়!"

অগ্নি বলল, "তুই বলতে চাস, একজন ই টি দেখেছিস? অভ্রকে ই টি কিডন্যাপ করেছে।"

সোহম গভীর চিন্তা করতে-করতে বলল, "আমি ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। অমিতাভ পুরোপুরি সাইকোলজিক্যাল কেস। একদিন আমাকে বলেছিল, ম্যাথ্স বিষয়টা ওর দুঃস্বপ্নে আসে। ওর অবচেতন মনে ম্যাথসের ভয়ঙ্কর ভীতি স্ম্যাথ আকার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কলকাতায় ফিরে অমিতাভকে একজন ভাল সাইকায়াট্রিস্ট দেখাতে হবে। অগ্নি, তোর মামা একজন মনের ডাক্তার না?"

আমাদের জিপ ততক্ষণে টাউনের বাইরে এসে পড়েছে। লোকের ভিড় কমেছে কিন্তু রাস্তা অপেক্ষাকৃত সরু। খানাখন্দে ভরা। হেডলাইটের তীব্র আলোর বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমাদের আগের গাড়িটা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। লাল টেললাইটটাও দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি এমনই হঠাৎ-হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে যে, আমরা সবাই পাশে কোনও হ্যান্ডেল বা সামনের সিট শক্ত করে ধরে রেখেছি। অভ্রর জন্য দুশ্চিন্তা ক্রমশ চেপে ধরছে। কেমন আছে ও কে জানে! কারা যে ওকে তুলে নিয়ে গেল! কেবল মৈনাকদাই নির্বিকার।

বন্ধুদের মাথাতেও অভ্রর জন্য দুর্ভাবনা বোঝা গেল যখন সোহম বলে উঠল, "মৈনাকদা, তুমি যতই নিশ্চিন্ত থাকো, আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না। এমন বিপদে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় নাকি?"

জিপের ড্রাইভার ইসমাইলদার পাশের সিটে মৈনাকদা চুপচাপ বসেছিল। তেরছা হয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, "প্রাচীন যুগ থেকে অন্য গ্রহের মহাকাশযান আমাদের পৃথিবীতে আসে, এই সম্ভাবনা তো আজকাল বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ...অন্তত অস্বীকার করছেন না। কর্নেল ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সেগানের গণনা অনুযায়ী আমাদের ছায়াপথে আড়াইশো বিলিয়ন নক্ষত্র আছে। তাদের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ নক্ষত্রের এমন বাসযোগ্য গ্রহ থাকতে পারে, যেখানে উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতার অস্তিত্ব আছে। সেসব গ্রহ থেকে ইউ এফ ও চেপে প্রাণীরা এখানে আসতেই পারে! জানিস তো, আমেরিকার স্কাইল্যাব-থ্রি ১৯৭৩ সালে ইউ এফ ও-র ফোটো তুলে পাঠিয়েছিল নাসাতে। আজ পর্যন্ত যত অ্যাস্ট্রোনট মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই ইউ এফ ও দেখেছে..."

তোড়া ডুকরে উঠে বলল, "তা হলে কী হবে মৈনাকদা?

তুমিও বলছ অভ্রকে অন্য গ্রহের প্রাণী তুলে নিয়ে গিয়েছে!" আমি বললাম, "যদিও আমার মা'র নিজের দাদু স্বচক্ষে ইউ এফ ও দেখেছিলেন, তবু আমি মনে করি যে গোটা ব্যাপারটাই ইলিউশন। মায়া। যেমন মরুভূমির মরূদ্যান!"

অগ্নি আমার কলার ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "খবরদার! মেয়ার বলেছেন, ইউ এফ ও আছে। ফের যদি তুই মায়া, ইলিউশন বলেছিস তো!"

থমকে থেমে গেল অগ্নি।

আকাশে একটা আলো। সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন। সামনে রাস্তার বিশ-তিরিশ ফুট উপরে। বিরাট ডিমের মতো দেখতে একটা বস্তু। নীলচে ও কমলা রং মেশানো আলো স্থির নিশ্চল বস্তুটা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমরা সকলে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। ইসমাইলদা গাড়ি থামিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। ধীরে-ধীরে বস্তুটা উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে প্রান্তরের উপরে নামল। গুঞ্জনের শব্দ থেমে গেল।

মৈনাকদা চাপা স্বরে ইসমাইলদাকে বলল, "হেডলাইট নিভিয়ে মাঠের উপর ওদিকে জিপটাকে নিতে পারবে?"

ইসমাইলদা বলল, "ইঞ্জিন যে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল! কী হল বুঝতে পারছি না..." বলতে-বলতে ইঞ্জিন আবার চালু হয়ে গেল, হেডলাইট জ্বলে উঠল। নিস্তব্ধ পরিবেশে জিপের পুরনো ইঞ্জিন যেন গর্জন করে উঠল। আলো নিভিয়ে শামুকের গতিতে ইসমাইলদা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামাল গাড়ি। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, "মৈনাকদা, কী দরকার ওদিকে গিয়ে, বরং পুলিশকে খবর দিলে হয় না?"

সোহমের উত্তেজিত গলা শোনা গেল অন্ধকারে, "নিশ্চয়ই ইউ এফ ও। আমাদের তুলে নিতে এসেছে।"

অগ্নি বলল, "ভালই হল, অভ্রর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।"

আমাদের জিপ এবড়োখেবড়ো মাটিতে গোঁ-গোঁ শব্দ করে লাফাতে-লাফাতে অত্যন্ত ধীরে চলেছে। ইসমাইলদা বলল, "সামনে নালা আছে, আর এগোনো যাবে না স্যার। গরমকাল হলে পেরিয়ে যেতাম, কিন্তু ক'দিন তুমুল বৃষ্টিতে জলে ভরে গিয়েছে।"

জিপ থেকে নালার ধারে নেমে পড়লাম আমরা। সরু, অগভীর নালা, বড়-বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে জলের স্রোত ছুটে চলেছে। চাঁদের আলোয় ওপারে একটা দশ-বারো ফুট উঁচু আড়াআড়ি লম্বা একটি ঢিবি চোখে পড়ল। ঢিবির গায়ে ঝোপঝাড়, কয়েকটা বড় গাছ। ওই অদ্ভুত বস্তুটা ঢিবিটার ওদিকে নেমেছে, দেখা যাচ্ছে না। সেটার কাছে পৌঁছতে হলে ঢিবি বেয়ে ওপাশে যেতে হবে। মৈনাকদার হাতে জোরালো টর্চ। বলল, "কয়েকটা ফ্ল্যাট পাথর পার হয়ে নালা ক্রস করা কোনও ব্যাপার নয়। পাঁচ বছরের শিশুও পারবে। ইসমাইলভাই, গাড়িতেই থাকো, আমরা ঘুরে দেখে আসি।"

তোড়ার উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। মৈনাকদার টর্চের আলোয় পাথরে পা ফেলে-ফেলে দিব্যি পৌঁছে গেল ওদিকে। সব শেষে আমি। যদিও একবার টাল খেয়ে গিয়েছিলাম, অগ্নি আমার হাত টেনে সামলে নিয়েছে।

ঢিবির উপরে উঠে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, প্রায় দুশো ফুট দূরে এক বিশাল ডিম্বাকৃতি বস্তু চাঁদের আলোয় চকচক করছে। বোধ হয় দোতলা বাড়ির সাইজ। তার চারটে পা। সেটার গোড়ায় দু'জন মনুষ্যাকৃতি প্রাণী কী যেন টানাটানি করে নামাচ্ছে। তাদের পরনে রুপোলি ওভারঅল। তাদের দুটো হাত, দুটো পা, মাথা একদম ফুটবলের মতো গোল। উচ্চতা পাঁচ ফুটের মতো।

এই সময় সোহম ভুল করে বসল। মৈনাকদার শক্তিশালী টর্চটা ওই প্রাণীদের তাক করে জ্বালাল বোধ হয় ওদের স্পষ্ট দেখার জন্য। অমনি ওদের একজন দূর থেকে আন্দাজে মনে হয় একটা মেয়ে চমকে উঠে পেনসিলের মতো দেখতে কোনও জিনিস আমাদের দিকে লক্ষ করে নিশানা করল। ওটা থেকে তীক্ষ্ণ আলো ছিটকে বেরিয়ে সোহমের টর্চে আঘাত করল। তৎক্ষণাৎ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল কাচ আর ব্যাটারি, রিফ্লেকটরসমেত টর্চটা বেঁকে তুবড়ে গেল সোহমের হাতে। উত্তপ্ত টর্চ ভয়ে দূরে ছুড়ে দিল সোহম।

তার মানে ওরা আমাদের টর্চকে কোনও অস্ত্র ভেবেছিল, তাই আক্রমণ করেছিল ওদের উন্নত অস্ত্র দিয়ে। ওদের মহাকাশযানের গর্ভ থেকে একটা মই নেমে এল। ওরা বেয়ে উঠে গেল ভিতরে। তারপর অস্ফুট দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। হালকা গুঞ্জনের মতো ইঞ্জিনের আওয়াজ চালু হল, ক্রমে জোরদার হল শব্দ।

বাঁশির সুরের মতো একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, "আমরা তোমাদের ক্ষতি করতে আসিনি। আমরা চাই পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করুক।"

তার মানে ওরা আমাদের টর্চকে কোনও অস্ত্র ভেবেছিল, তাই আক্রমণ করেছিল ওদের উন্নত অস্ত্র দিয়ে। ওদের মহাকাশযানের গর্ভ থেকে একটা মই নেমে এল। ওরা বেয়ে উঠে গেল ভিতরে। তারপর অস্ফুট দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। হালকা গুঞ্জনের মতো ইঞ্জিনের আওয়াজ চালু হল, ক্রমে জোরদার হল শব্দ। নীলচে-কমলা রঙের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে শূন্যে ভেসে উঠল সেই যান। পনেরো... তিরিশ ফুট উঁচুতে উঠে নিঃশব্দে সমান্তরাল উড়ে এল আমাদের দিকে। কয়েক মুহূর্ত আমাদের মাথার উপর স্থির থেকে হঠাৎ গতি বাড়িয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। আমরা তাকিয়ে রইলাম নির্বাক।

মৈনাকদা বলল, "আয় আমার সঙ্গে। মনে হচ্ছে আমাদের জন্য কিছু রেখে গেছে ওখানে..."

যেখানে গ্রহান্তরের যান নেমেছিল সেখানে শুকনো ঝোপঝাড় তখনও ধিকিধিকি আগুনে পুড়ছে। কুড়ি-বাইশ ফুট বৃত্তের মধ্যে মাটি পুড়ে গিয়েছে। সেই বৃত্তের চারটে কোণে প্রায় দু'ইঞ্চি গভীর চারটে গর্ত পায়ার চিহ্ন। মৈনাকদা গর্তগুলোর গভীরতা দেখে বলল, "হুম, অন্তত পঁচিশ-তিরিশ টন ওজন..."

হঠাৎ অন্ধকারে একটু দূরের ঝোপে খচমচ শব্দ। কে যেন বলে উঠল, "তোরা এখানে কী করছিস?" *(ক্রমশ)*

ছবি: বৈশালী সরকার

যা হয়েছে

সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণ

ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার এরিনা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে গানের অনুষ্ঠানের শেষে, রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আত্মঘাতী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে স্টেডিয়াম চত্বর। পুলিশ, শিশু সহ ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে এই হামলায়। ১১৬ জন আহত হয়েছেন। আফগানিস্তানের কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের সামনেও গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩৫০ জন।

সেতুর উদ্বোধন

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী লোহিত নদীর উপর ৯.১৫ কিলোমিটার লম্বা ধলা-শদিয়া সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের দীর্ঘতম এই সেতুটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভূপেন হাজারিকা সেতু'। ২০১১ সাল থেকে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ভূমিকম্পরোধী ১৮২টি পিলারের উপর সেতুটি বানাতে খরচ হয়েছে ২,০৫৬ কোটি টাকা। এই সেতুর ফলে অসমের সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশের যাতায়াতের দূরত্ব ১৬৫ কিলোমিটার কমে গেল। সময়ও কমে গেল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা।

রিয়েল, বার্সেলোনা, জুভেন্তাস

এবছর বিশ্বফুটবলের বিভিন্ন লিগ শেষ হয়েছে। ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হল চেলসি ফুটবল ক্লাব। তবে এফ এ কাপের ফাইনালে আবার ২-১ গোলে চেলসিকে হারিয়ে ট্রোফি জিতে নিয়েছে আর্সেনাল। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর স্পেনের লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর রিয়েল মাদ্রিদ। রানার্স গতবারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। তবে স্পেনের কোপা দেল রে-এর ফাইনালে আলাভেজ় ক্লাবকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ২৯তম বার এই ট্রোফি জিতল বার্সেলোনা। জার্মানির বুন্দেশলিগায় এবার নিয়ে পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হল বায়ার্ন মিউনিখ। অন্য দিকে ইতালির সিরি এ লিগে এবারও চ্যাম্পিয়ন হল জুভেন্তাস। এই নিয়ে টানা ছ'বার লিগ জয় করল তারা।

সূর্য অভিযান

সূর্য অভিযানের পথে নাসা। ইসরোরও পরিকল্পনা রয়েছে 'আদিত্য' নামে সূর্য অভিযানের। তবে নাসার ৬০০ কিলোগ্রাম ওজনের 'সোলার প্রোব প্লাস' (এস পি পি) সূর্যকে পরীক্ষা করতে ২০১৮ সালে উড়ে যাবে বলে ঠিক হয়েছে। সূর্যের বাইরের অংশ 'করোনা'র তাপমাত্রা হাজার থেকে লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পরিবর্তিত হয়। যা ভিতরের চেয়েও বেশি। তাই সূর্য থেকে ৬৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে দেড়-দু'হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়, গায়ে মোটা কার্বন জ্যাকেট পরে সূর্যের উপর পরীক্ষা চালাবে এস পি পি।

যা হবে

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ৫ জুন তারিখটিকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে সচেতন করাই এই দিনটির উদ্দেশ্য। আমাদের চারপাশের দূষণ মুক্ত জল, বায়ু, মাটি, আকাশ, প্রকৃতি, পরিবেশ সবই সুস্থ-সুন্দর, নীরোগ জীবনের জন্য মানুষের একমাত্র অবলম্বন। অথচ নানা কাজের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের ক্ষতিই করে চলেছি। সভ্যতা যত এগিয়ে চলেছে, পরিবেশও তত দূষিত হয়ে পড়ছে। তাই বছর-বছর এই দিনটি পরিবেশ রক্ষায় আমাদের ভুলে যাওয়া অঙ্গীকারকে মনে করিয়ে দিতে ফিরে আসে। সবুজায়ন, গাছ, জলাভূমি, বনভূমি রক্ষা করা ছাড়া যে মানুষের কোনও বিকল্প নেই সেই কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিতে এবছর দিনটি পালিত হবে।

বিশ্ব শিশুশ্রমিক বিরোধী দিবস

২০০২ সাল থেকে ১২ জুন দিনটি আই এল ও-র (ওয়ার্ল্ড লেবার অরগানাইজ়েশন) উদ্যোগে বিশ্ব শিশুশ্রমিক বিরোধী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আজ অনেক পথ পার হয়ে এগিয়ে এসেছে মানবসভ্যতা। কিন্তু তবুও শিশুশ্রম মুক্ত করা যায়নি পৃথিবীকে। আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে। বিভিন্ন দেশেও শিশুশ্রম বিরোধী নানা কঠোর আইন তৈরি হয়েছে, তবুও। ছোট-ছোট শিশুদের কাজের জায়গা থেকে থেকে সরিয়ে এনে, জীবনের সঠিক বিকাশের পথে তাদের পরিচালিত করতে, শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে এবছরও ১২ জুন দিনটি বিশ্ব শিশুশ্রমিক বিরোধী দিবস হিসেবে পালিত হবে।

ফিফা কনফেডারেশন কাপ

ফিফার অধীন বিশ্বের ছ'টি মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থার চ্যাম্পিয়ন দল অংশ নেয় প্রতি চার বছর অন্তর হওয়া কনফেডারেশন কাপ টুর্নামেন্টে। আগামী ১৭ জুন থেকে ২ জুলাই রাশিয়ার চার শহরে আটটি দলকে নিয়ে দশম কনফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বকাপজয়ী জার্মানি, সংগঠক দেশ রাশিয়া, ইউরো কাপ চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল ও কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন চিলি খেলবে সেখানে। উত্তর আমেরিকায় 'কনকাফ কাপ' চ্যাম্পিয়ন মেক্সিকো, 'আফ্রিকা কাপ অফ নেশন্স' চ্যাম্পিয়ন ক্যামেরুন, এশিয়া থেকে 'এ এফ সি এশিয়ান কাপ' চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবং 'ওশিনিয়া ফুটবল কনফেডারেশন নেশন্স কাপ' চ্যাম্পিয়ন নিউজ়িল্যান্ডও থাকছে এই টুর্নামেন্টে।

ফারাক পাও

দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

ছবি: প্রীতম দাশ

উত্তর : ২০ জুন সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১) লরির সামনের লোগোটি উলটো।
২) বাঁ দিকের সামনের লাইটপোস্টটি ছোট।
৩) রাস্তায় বড় পাত্রটি সরে গিয়েছে।
৪) মালগাড়ির ভিতরে একটা বস্তা কম আছে।
৫) লরির হেডলাইটের আকারে পরিবর্তন হয়েছে।
৬) পাশের লরির ব্যাক লাইটটি সরে গিয়েছে।
৭) গাছের ডালের পরিবর্তন হয়েছে।
৮) লরির সামনের নম্বরপ্লেটটি আকারে বড়।

সুদোকু

৮		৩						
				৬	২			৫
		৫	১		৮	৩		
	৭			৩				৯
	৩	৯	৮		৭	৬	৫	
২				১			৪	
		৬	৫		৩	২		
১			৭	৪				
						৯		৭

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৯	২	৮	৪	৩	১	৫	৭	৬
১	৫	৭	২	৮	৬	৩	৪	৯
৬	৩	৪	৭	৫	৯	৮	২	১
২	৭	৬	৮	৪	৩	৯	১	৫
৮	৯	৫	৬	১	৭	৪	৩	২
৪	১	৩	৫	৯	২	৭	৬	৮
৩	৮	২	৯	৬	৪	১	৫	৭
৫	৬	১	৩	৭	৮	২	৯	৪
৭	৪	৯	১	২	৫	৬	৮	৩

আমার বই

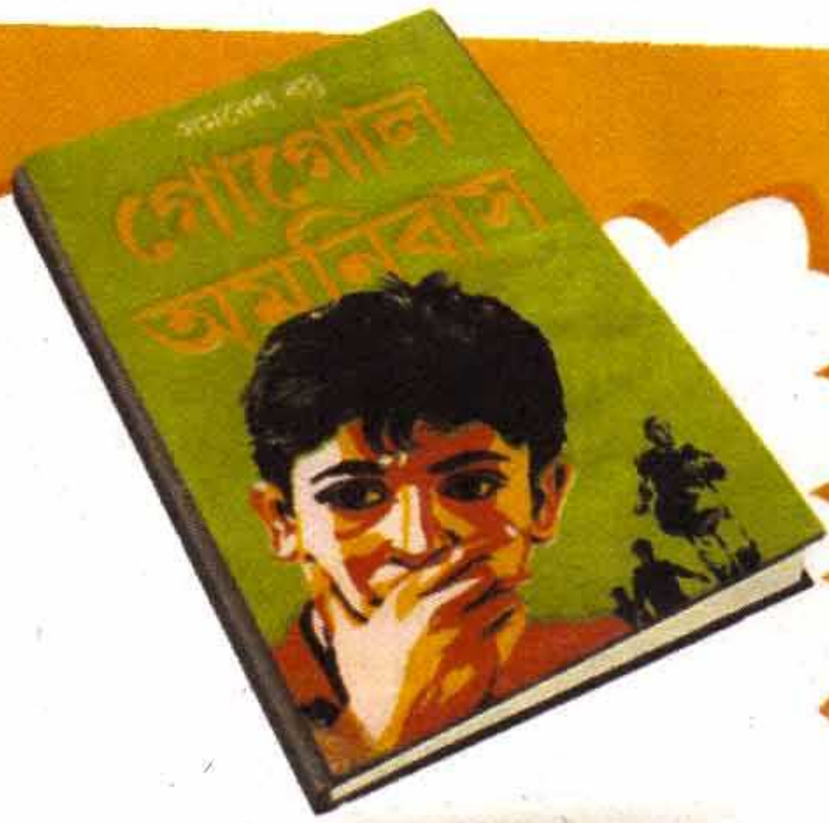

গোগোল অমনিবাস

গোগোলের কাহিনিতে ভূত আছে, রহস্য আছে, রোমাঞ্চের শিরশিরানি আছে খুব, শুধু অপরাধের নকশাগুলোয় জটিলতা কম আর দুষ্কৃতীরাও যেন একটু কম কুচক্রী। সময়টা একটা মস্ত কারণ যদি হয়, আর-একটা কারণ অবশ্যই লেখকের হাতযশ আর ছোটদের মনকে পড়া, যে কারণে সেই সাত-আট দশকে লেখা গোগোলের গল্পগুলো এখনও সকালের রোদ্দুরের মতো তরতাজা। গোগোলের বন্ধু হতে আমাদের আজও ভারী ভাল লাগবে। কারণ, গোগোল যে এখনও আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে। একলা একটা ছেলে। সারাদিন কী করবে ভেবে পায় না। বাবা অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন, মা বাড়িতে। তিনি ওকে আগলান, গল্প শোনান। ও সেসব শোনে আর মাঝেমধ্যে খাতায় নিজেও কিছু লেখে। তবে তাতে সব সময়টা ফুরোয় না। কৌতূহলে ভর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আর রহস্যের খাসতালুকে পৌঁছে যায় অমনি, পরপর সব অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে চলে ওকে ঘিরে, ঠিক যেমনটি শুধু গল্পে বা স্বপ্নেই হয়। কাশ্মীরে দূরের বরফ-পাহাড় আর আপেল গাছ দেখেই তো ছুটি কাটানোর কথা ছিল। কিন্তু গোগোল আচমকা আবিষ্কার করে ফেলল ভ্যানে লুকিয়ে থাকা ব্যাঙ্ক ডাকাতদের। আবার 'রত্নরহস্য ও গোগোল'-এ তো সে একটু এয়ারপোর্টে বইয়ের দোকানে গিয়েছিল আর অমনি কিনা হিরের চোরাচালানকারী তাকেই পাচারের 'মিডিয়াম' বানিয়ে নিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, গোয়েন্দারা যেমন বুদ্ধি খাটিয়ে, নানা পরিকল্পনা সাজিয়ে অপরাধের কিনারা করেন, গোগোল কিন্তু ওসবের ভিতরেই যায় না। সে বাবা-মায়ের শান্ত, বাধ্য ছেলে। ডানপিটে বা ডেঁপো নয় মোটে। বিশেষ কোনও চেষ্টা বা কৌশল ছাড়া ছেলেমানুষিটুকু অটুট রেখেই হয়ে ওঠে কাহিনির নিয়ামক বা কেন্দ্র। অনেকদিন আগে সমরেশ বসু আনন্দমেলার পাতাতে লিখতেন গোগোলের এই গল্প, যার সারল্যের সামনে অনেক কেতাদুরস্ত গোয়েন্দাগল্পই ফিকে। গোগোলের এই বইয়ে আঠারোটি গল্প। যেমন ছবির মতো নিটোল বর্ণনা, তেমন জমাটি কাহিনি, এদিকে ভয়ানক সব কাণ্ডের ভিতরে গোগোলের ছোট্ট মনটির ভয়, আনন্দ, জিজ্ঞাসা, ইচ্ছেগুলোর দৌরাত্ম্য। পকেটে দুর্মূল্য হিরে থাকলেও যে বাথরুম যেতে চায়। এদিকে অঙ্কে কম পেলে মায়ের ভয়ে সামনে নাচতে পারে না। এর পরও কি তাকে ভাল না বেসে উপায় থাকে?

কী করব বেশি পড়েও রেজ়াল্ট ভাল না হলে?

সৎমানুষ হলে বলতে পারবে না তিতির পড়ায় ফাঁকি দেয়। সারাবছর নিয়ম করে স্কুলের পড়া তো করেই, ছুটিতেও যে দুপুরগুলোয় গেনু তেড়ে ঘুমোয়, সে তখন স্কুলে যেগুলো হয়নি, সেই পরের অধ্যায়গুলোর পড়াও এগিয়ে রাখে। মুখস্থ করে, না দেখে লেখে। রেফারেন্স বই পড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, এগুলো সে নিজের উদ্দীপনায় করে। যা-যা করা উচিত, সবগুলো করে কেন ওর রেজ়াল্টটা ঠিক অতটা ভাল হয় না? তা হলে কি 'পরিশ্রমের বিকল্প নেই' কথাটাই বাজে, মিথ্যে?

তিতির আর তিতিরের মতো যারা, তাদের জন্য সমবেদনা। খুব কষ্ট হচ্ছে জানি। মনটা চুরমার আর চোখের সামনে এতদিনকার গড়ে তোলা ধারণাগুলো ঝাপসা হয়ে গিয়েছে তাও ঠিক। কিন্তু ওই টুকরো হয়ে যাওয়া মনের টুকরোগুলো জোড়া লাগানোর কাজটা তোমাকেই করতে হবে। এ লড়াই পরীক্ষায় ভাল ফল করার চেয়ে অনেক কঠিন। আর সেজন্যই কঠিনকে জয় করার আনন্দটাও যে বেশি। সেই আনন্দটুকুতে ভর দিয়েই তুমি পরের পরীক্ষার জন্য উঠেপড়ে লাগার ইচ্ছেটাকে ধরে রাখো। হয়তো সে ইচ্ছেটা এখন অনেক দূরে। কিন্তু তাকে হাওয়া-জল আর ভালবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা, কাছে আনাই তোমার এই মুহূর্তের পরীক্ষা। আর এখানে তোমায় জিততেই হবে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে তোমার এতদিনের ফাঁকি না মারার সুঅভ্যেস। তুমি যদি রোজের পড়া রোজ করো, তা হলে জীবন তোমায় পুরস্কার দেবেই। আজ না হলেও কাল। সব ফল হাতে-নাতে হয় না, কিছু তফাতেও থাকে। যত দিন যাবে, জীবনের দরজাগুলো খুলবে, আরও পরীক্ষা আসবে, তুমি টের পাবে এতদিন ধরে পায়ের নীচের মাটিটা কেমন দৃঢ় হয়েছে! তোমায় কেমন ভরসা দিচ্ছে, শক্তি দিচ্ছে সে। আজকের এই হার আসলে তোমার কালকের জয়ের ভিত। সেদিন বুঝবে, পরিশ্রমী, সৎ থাকার পুরনো কথাটি কত সত্যি আর সার্থক।

সুদেষ্ণা ঘোষ

করবে কী

আমাদের স্কুলের একটা মেয়ে আমাকে খুব বিরক্ত করে। সব সময় ঝগড়া করে, ক্লাসে ঠেলা মারে। অনেকবার ম্যামকে বলেছি কোনও লাভ হয়নি। কী করব?

অনুষ্কা দে
তৃতীয় শ্রেণি, দি আরিয়ানস স্কুল, কলকাতা।

ধরেই নিচ্ছি মেয়েটি তোমার সহপাঠী। ম্যামকে বলেও যখন ওকে বদলাতে পারলে না, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নেওয়া। একবার যদি ও তোমাকে বন্ধু বলে মেনে নেয় তা হলে দেখবে তোমার প্রতি ওর সব দুষ্টুমি বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি রেগে যাও বলেই না ও সেই কাজগুলো বেশি করে করে। এটা দুষ্টু মেয়েরা করেই থাকে। এবার থেকে ও ঝগড়া করতে এলে বা তোমাকে ঠেলা মারলে তুমি এমন ব্যবহার করবে যেন তোমার খুব মজা লাগছে। এরকম কয়েকদিন করলেই দেখবে ব্যাপারটা বদলে গিয়েছে।

ঘোষণা

তোমাদের যে-কোনও সমস্যার সমাধান পেতে চাইলে চিঠি লিখে জানাতে পার আমাদের। সমাধান করবে আনন্দমেলা।
ঠিকানা: আনন্দমেলা 'করবে কী' বিভাগ ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০০১

আমার সব বিষয় পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু অঙ্কটা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। প্রচুর ভুল করি। ফলে প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দমে যাই। উৎসাহ পাই না। অথচ অঙ্ক তো করতেই হবে মাধ্যমিক শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কী করে অঙ্কে ভাল করতে পারব?

রূপকথা মাহাত
পঞ্চম শ্রেণি, ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

খুব কম ছেলেমেয়েই আছে, অঙ্ক নিয়ে যাদের সমস্যা নেই। অঙ্ক বিষয়টাকে ভালবাসতে হবে। প্রথম থেকেই যদি ধরে নাও 'এটা আমার দ্বারা হবে না', তবে তো তুমি লড়াইয়ে নামবার আগেই হার স্বীকার করে নিলে। অঙ্কে ভাল করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, প্র্যাকটিস করা। যে অঙ্কগুলো বইয়ে রয়েছে সেগুলো বারবার প্র্যাকটিস করে যাও। অঙ্ক মুখস্থ করার চেষ্টা কোরো না। বরং বোঝার জন্য শিক্ষক বা বাড়ির বড়দের সাহায্য নাও। একবারে না বুঝলে আবার জানতে চাও, লজ্জা কোরো না। অঙ্কের নিজস্ব একটা নিয়ম বা যুক্তি থাকে। একবার সেটা বুঝে ফেলতে পারলে সারাজীবন আর কখনও ভুল হবে না। সেটা জ্যামিতি, পাটিগণিত এবং ভবিষ্যতে বীজগণিত সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আমি গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসি। টাকা জমিয়ে, কখনও দাদুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি প্রচুর বই কিনি। কিন্তু বাড়ির লোক আমার এ ব্যাপারটা একদমই ভাল চোখে দেখেন না। তাঁদের ধারণা, এসব বাজে খরচ।

সোহম হাজরা
অষ্টম শ্রেণি, সিউড়ি পি অ্যান্ড সি এম এম হাই স্কুল, বীরভূম।

বই পড়া তো ভাল অভ্যেস। আর গল্পের বই পড়লে কল্পনাশক্তি বাড়ে। ভাষাজ্ঞানও ভাল হয়। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে কি সেটা মাত্রাছাড়া পর্যায়ে পৌঁছে যায়? আর তাই শুধুই গল্পের বই পড়ো, স্কুলের পড়া না করে? এর ফলে নিশ্চয়ই তোমার রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে? সেসব কথা তুমি কিন্তু লেখোনি। তা হলে কী করে বুঝব আসল সমস্যাটা কোথায়?

আমার সব বিষয় পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু সেটা মুখস্থ করতে একদম ভাল লাগে না। ফলে পরীক্ষায় নম্বর কমে যায়। যে উৎসাহ নিয়ে বাংলা গল্পের বই পড়ি, স্কুলের পড়া করতে গিয়ে তা হারিয়ে ফেলি। কী করব?

বৃষ্টি জানা
ষষ্ঠ শ্রেণি, কারমেল হাই স্কুল, কলকাতা।

তোমাকে কে বলেছে মুখস্থ করতে পার না বলে নম্বর কমে যায়? একেবারে ভুল ধারণা। তা ছাড়া, না বুঝে সব কিছু তো মুখস্থ করা এবং মনে রাখা সম্ভব নয়। জোর করে সে চেষ্টা করলে বারবার ভুল করবে, বিরক্ত হবে, শেষে শেখার আনন্দটাই হারিয়ে যাবে। ঠিক যে কারণে তোমার গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে, আর পড়ার বই দেখলেই গায়ে জ্বর আসে। যাই পড়ো না কেন, আগে সেটা বুঝে মাথায় বসিয়ে নাও। তা হলেই দেখবে যত পড়ছ, তত সোজা লাগছে। মুখস্থ সেটাই করবে, যেটা তুমি বুঝে নিয়ে তোমার মতো করে লেখার সুযোগ পাবে না। যেমন কবিতা, ইতিহাসের সাল-তারিখ ইত্যাদি।

সেরা চিঠি

আমার খাওয়া খুব ধীরে। বন্ধুরা অধিকাংশ দিনই নিজেদের টিফিন শেষ করে আমার খাবারগুলোও খেয়ে নেয়। কী করব? তাড়াতাড়ি খেতে পারি না বলে সমস্যা হয়।

অলোকেন্দু চট্টোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণি, এম ডি বি ডি এ ভি পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া।

একটা কথা জানবে, যে তাড়াতাড়ি খেতে পারে তার ভাগ্যে সবসময়ই ভাল-ভাল খাবার জোটে। আর দেরি করা মানেই খাবার ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এই যেমন তোমার ক্ষেত্রে হয়। বাড়ি থেকে আনা ভাল খাবারগুলো তোমার বন্ধুরা খেয়ে নেয়। সে তো নেবেই। চোখের সামনে ভাল-ভাল খাবার আছে দেখলে কে আর কতক্ষণ লোভ সামলে চুপচাপ বসে থাকতে পারে বলো! বন্ধুদের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার একটাই উপায়, চটপট খেয়ে নেওয়ার অভ্যেস করা।

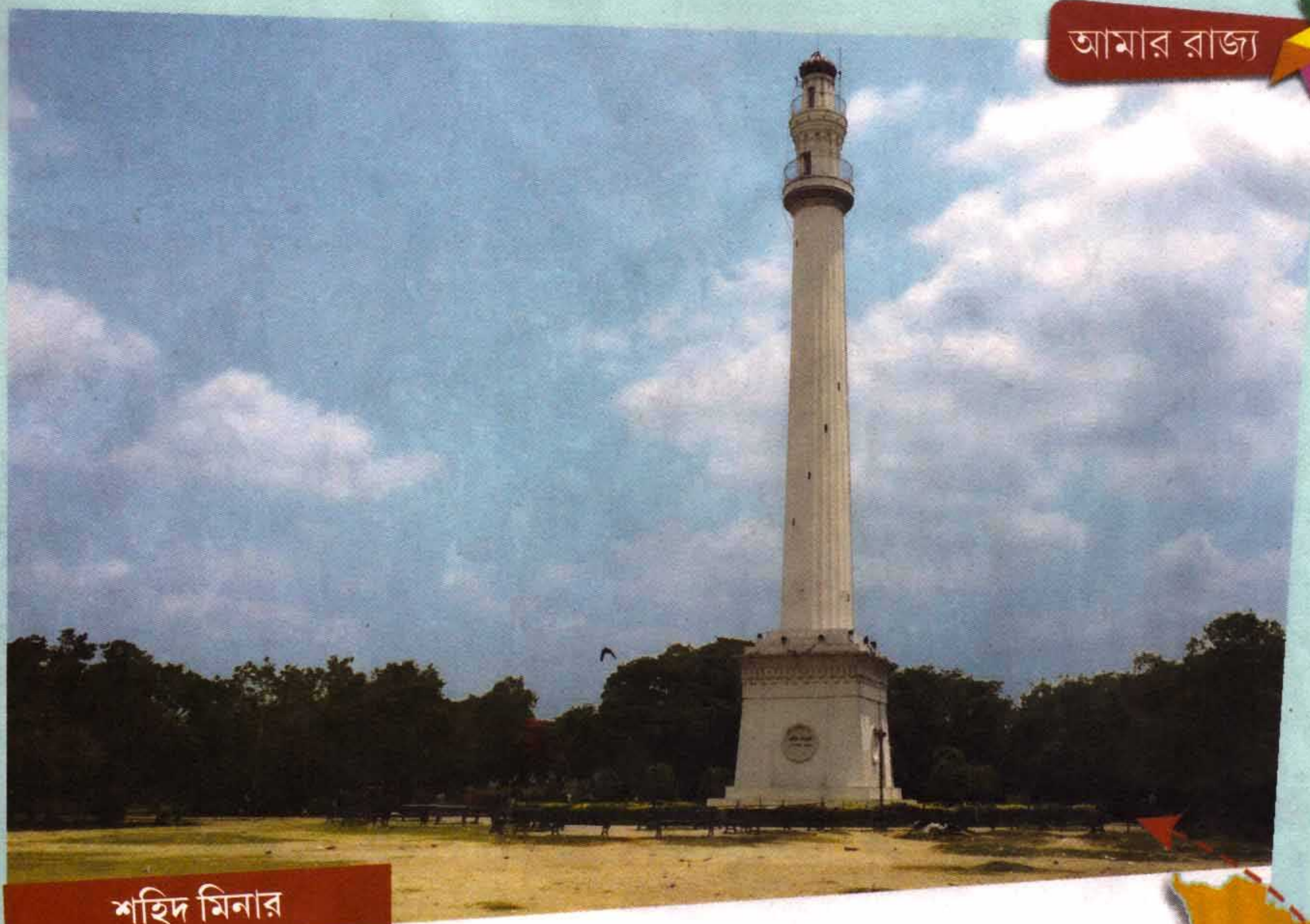

শহিদ মিনার

এই মিনারটি নির্মাণ করা হয়েছিল মিশরীয় স্থাপত্যের অনুসরণে। লিখেছেন **সিজার বাগচী**

কলকাতায় এসেছে অথচ শহিদ মিনার দেখেনি এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। কিন্তু ১৫৭ ফুট উচ্চতার এই মিনারটি দেখলে কি বোঝা যায়, ১৮২৮ সাল থেকে কত ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে ওই মিশরীয় স্থাপত্যের অনুসরণে নির্মিত স্তম্ভটি আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে? ওই মিনারে যেমন মিশে ব্রিটিশ ভারতের কাহিনি, তেমনই মিশে স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাসও।

ব্রিটিশরা ওই মিনারটি তৈরি করেছিলেন মেজর জেনারেল ডেভিড অক্টারলোনির স্মরণে। তখনও সিপাহি বিদ্রোহ হয়নি। ভারতের উপর ব্রিটিশদের একাধিপত্যও কায়েম হয়নি। মুঘলদের ভিত নড়বড়ে হলেও একেবারে ভেঙে পড়েনি। যুদ্ধ চলছে নানা জায়গায়। তেমনই সময় মরাঠাদের হাত থেকে দিল্লি রক্ষা করে এবং নেপালিদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে ডেভিড অক্টারলোনি নাইটহুড পান। ভারী বর্ণময় চরিত্র ছিলেন এই অক্টারলোনি। তাই মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই জনগণের টাকায় তৈরি হয়েছিল অক্টারলোনি মনুমেন্ট।

স্তম্ভটির নকশা করেছিলেন জে পি পার্কার। তৈরি করেছিল বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, শহিদ মিনারের উপর দিকের সঙ্গে সিরিয়ার স্থাপত্যের মিল রয়েছে। আর চূড়াটি তো তুরস্কের ডোমের মতো। শহিদ মিনারের মাথায় দুটো ব্যালকনিও আছে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা ২১৮টি সিঁড়ি বেয়ে সেই ব্যালকনিগুলোয় ওঠাও যায়। তবে আজকাল আর চাইলেই ঢোকা যায় না। তার আগে কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

১৯৬৯ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদদের স্মৃতিতে অক্টারলোনি মনুমেন্টের নাম বদলে করা হয়েছিল শহিদ মিনার। তবে চলতি কথায় এই স্তম্ভকে মনুমেন্টও বলা হয়। তাই ওই মিনার নিছক মিনার নয়, ইতিহাসের এক অংশও।

ফোটো: প্রীতম দাশ

আই পি এল জয়ের পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দল

আই পি এল এবং ভবিষ্যতের তারকা

সদ্যসমাপ্ত আই পি এল শেষে মুম্বইয়ের জয়ের পাশাপাশি উঠে এলেন বেশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড়ও। লিখছেন **স্বর্ণাভ দেব**

আইপিএল উৎসবের দশম বর্ষের সমাপ্তির পরে ফের এক বছরের অপেক্ষা। আগামী বছরে আবার নতুন করে টিম কেনা হবে, নিলামেও তোলা হবে খেলোয়াড়দের। তবে বিগত মাসদেড়েক আই পি এল-এ বুঁদ দর্শকরা দেখলেন কিছু রুদ্ধশ্বাস লড়াই। উঠে এলেন বেশ প্রতিভাবান কিছু খেলোয়াড়ও। সেই নিয়ে চর্চার শুরুতেই বলে নেওয়া যাক, এবার যোগ্য দল হিসেবেই চ্যাম্পিয়নের তাজ উঠল মুম্বইয়ের মাথায়। গ্রুপ পর্বের খেলায় বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করলেও বারে-বারেই মুম্বইয়ের রথ থমকেছে রাইজ়িং পুণে সুপারজায়ান্টস-এর কাছে। এমনকী কোয়ালিফায়ারেও মহারাষ্ট্র ডার্বি হেরে ফাইনালে যাওয়ার জন্য কে কে আর-এর মুখোমুখি হয়েছিল রোহিত শর্মার দল। তবে ফাইনালে 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে' এই আপ্তবাক্যকে বাস্তব রূপ দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পুণেকে এক রানে পরাজিত করে তারা। সঙ্গে 'হারার আগে হাল ছেড়ো না' এই বিষয়টিই প্রতিষ্ঠিত করল তারা। মাত্র ১২৯ রানের পুঁজি নিয়েও মুম্বই দেখিয়ে দিয়েছে জয়ের উদগ্র বাসনা কতখানি ছিল তাদের। প্রতিবারের মতো এবারেও মুম্বই দল ছিল তারকা ঠাসা। রোহিতের দুরন্ত নেতৃত্ব তো ছিলই, কোচিং স্টাফে মাহেলা জয়বর্ধনে, জন্টি রোড্‌সদের মতো তারকার দ্যুতিও এই দলে ছিল। তবে আসল পার্থক্য গড়ে দিলেন একঝাঁক তরুণ। হার্দিক পাণ্ড্য, ক্রুনাল পাণ্ড্য, নীতিশ রানা, করণ শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহের তারুণ্যের জোশ চলতি বছরে নিঃসন্দেহে মুম্বইকে অক্সিজেন জুগিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। শুধু মুম্বইকেই নয়, আই পি এল-এর বাকি দলগুলোকেও ভরসা দিয়েছেন একঝাঁক তরুণ। দেখে নেওয়া যাক চলতি আই পি এল-এর সেরা আবিষ্কার কারা।

বাসিল থাম্পি

২০১৪-'১৫ সালে কেরলের হয়ে রঞ্জি খেলার সুযোগ আসে থাম্পির কাছে। তারপরে নিজের দুরন্ত পারফরম্যান্সের জেরেই সুযোগ পেয়েছেন গুজরাত লায়ন্সে। আবির্ভাবেই

চমকে দিয়েছেন এই ফাস্ট বোলার। ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে স্বচ্ছন্দে বোলিং করতে পারেন তিনি। সঙ্গে বলের মুভমেন্ট তো বটেই, পুরনো বলে রিভার্স সুইংয়ের মন্ত্রও জানা রয়েছে থাম্পির। তারই সুবাদে ১২ ম্যাচে ১১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁর বোলিংয়ের সুবাদে অনেকবারই ম্যাচে ফিরে এসেছে গুজরাত। পাবলিক ভোটে চলতি আই পি এল-এর এমার্জিং প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন তিনি।

ঋষভ পন্থ

দিল্লির এই তরুণ খেলোয়াড় আই পি এল-এর আগে থেকেই সকলের নজরে। বিগত রঞ্জি ট্রোফিতে ট্রিপল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েই লাইমলাইটে উঠে এসেছিলেন তিনি। তখন থেকেই বীরেন্দ্র সেহবাগের উত্তরসূরি হিসেবে ভাবা হচ্ছিল এই বিস্ফোরক ব্যাটসম্যানকে। স্বভাবতই তাঁকে নিয়ে নিলামেও উত্তেজনা ছিল চরমে। শেষ পর্যন্ত বেস প্রাইসের ১৯ গুণ টাকায় দিল্লি ডেয়ারডেভিল্স কিনে নেয় তাঁকে। দেখার ছিল নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেন কি না এই তরুণ। ১৪ ম্যাচে ৩৬৬ রান করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন ভবিষ্যতে ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমে দেখা যেতেই পারে তাঁকে। বিশেষত, গুজরাত লায়ন্সের বিরুদ্ধে অতিমানবীয় ৪৩ বলে ৯৭ রানের ইনিংস তো চোখধাঁধানো। মাত্র ২৫ বলে প্রথম আই পি এল অর্ধশতরান করেছেন তিনি। বুঝতেই পারা যায়, ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। এবারের আই পি এল-এ তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৬৫-এর উপরে। হয়তো মহেন্দ্র সিংহ ধোনির অবসরের পরে সীমিত ওভারের ম্যাচে উইকেটের পিছনে দেখা যেতে পারে এই খেলোয়াড়কেই।

বাসিল থাম্পি

নীতিশ রানা

ঋষভের মতো বিস্ফোরক না হলেও একার কাঁধেই ইনিংস গড়তে সক্ষম এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। বছরদুয়েক আগে রঞ্জিতে দিল্লির হয়ে কেরিয়ার শুরু করে প্রথম মরসুমেই ৫৫৭ রান করে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। পরে বিজয় হাজারে ও সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রোফিতেও আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে এই ব্যাটসম্যানকে। সেই সুবাদেই এবারে জায়গা করে নিয়েছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে। যে দলে তারকার ছড়াছড়ি, সেখানে প্রথম এগারোয় জায়গা করে নেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার, আর তার চেয়েও কঠিন দলে টিকে থাকা। শুরু থেকেই চমকে দিয়েছেন তিনি। এবারে ১৩ ম্যাচে ৩৩৩ রান করেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে গৌতম গম্ভীরকে পাশে পেয়েছেন নীতিশ। আবার আই পি এল-এ রিকি পন্টিংয়ের পরামর্শে নিজের টেকনিক উন্নত করেছেন। খুব দ্রুতই হয়ে উঠেছেন পরিণতমনস্ক।

রাহুল ত্রিপাঠি

মহারাষ্ট্রের হয়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে সফলভাবে খেললেও এবারের আই পি এল-এর সুবাদেই নজরে পড়েছেন এই ডানহাতি ওপেনার। রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টস প্রথম দিকে সেভাবে সাফল্য না পেলেও ত্রিপাঠিকে ওপেনার হিসেবে তুলে ধরার পর থেকেই বদলাতে থাকে টিমের গ্রাফ। রাহানের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে বেশ কয়েকটি ম্যাচে ফারাক গড়ে দিয়েছেন এই খেলোয়াড়। চলতি সিজনে ১৪ ম্যাচে ৩৯১ রান করেছেন তিনি, যা পুণে দলে সর্বোচ্চ। তার মধ্যে কে কে আর-এর বিরুদ্ধে ৫২ বলে ৯৩ রানের ইনিংস তো এখনও কে কে আর ভক্তদের কাছে দুঃস্বপ্নের!

রাহুল ত্রিপাঠি

নীতিশ রানা

ঋষভ পন্থ

ওয়াশিংটন সুন্দর

ওয়াশিংটন সুন্দর

তামিলনাড়ুর এই অলরাউন্ডার রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টস-এ সুযোগ পেয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বদলি হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে। শুরুর দিকে এই তরুণ খেলোয়াড়ের উপরে তেমন ভরসাও করতে পারেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু পরপর হারের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় সুন্দরকে। তখনই জ্বলে ওঠেন তিনি। পাওয়ার প্লে-তে তাঁর নিয়ন্ত্রিত বোলিং দলের পক্ষে দারুণ কার্যকরী হয়ে ওঠে। অথচ বিগত অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি! সেদিক থেকে সুন্দরকে চলতি আই পি এল-এর আবিষ্কার বলা যেতেই পারে।

আই পি এল যেমন এক দিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, তেমনই প্রতি বছরই উপহার দিয়েছে কয়েকজন প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড়। কিংবদন্তি বিদেশি খেলোয়াড় ও কোচদের সঙ্গে ড্রেসিংরুমে সময় কাটিয়ে ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের রিজ়ার্ভ বেঞ্চ। এই হাইপ্রোফাইল টুর্নামেন্ট থেকে সেরা প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে এটাই।

ছোট ছোট খেলা

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

কুস্তিতে বজরঙ্গের সোনা

কুস্তিতে সোনা জিতে নজর কাড়লেন ভারতের বজরঙ্গ পুণিয়া। নয়াদিল্লিতে এবারে এশীয় কুস্তিতে সব মিলিয়ে ভারত দশটি পদক জেতে। তবে তার মধ্যে কেবল পুরুষদের ৬৫ কিলোগ্রাম বিভাগে দেশকে একটি মাত্র সোনা এনে দিয়েছেন বজরঙ্গই। ফাইনালে তিনি হারিয়ে দিয়েছেন কোরিয়ান কুস্তিগির সাংচুল লিকে। একটা সময় পিছিয়ে পড়েও লড়াইয়ে শেষ হাসি হেসেছেন পুণিয়া। ম্যাচে এক সময়ে ২-০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন লি। তারপরেই ঘুরে দাঁড়ান বজরঙ্গ। ৬-২ পয়েন্টে ম্যাচ শেষ করে, সোনা জিতে নেন এই ভারতীয় কুস্তিগির। রিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী কুস্তিগির সাক্ষী মালিককেও এবারের এশীয় কুস্তিতে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। গ্যালারিতে বসে ফাইনালের দুর্দান্ত লড়াই দেখেছেন লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী কুস্তিগির যোগেশ্বর দত্ত। ২৩ বছরের সোনাজয়ী বজরঙ্গকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি।

শারাপোভার চোখে উইম্বলডন

জুলাইয়ের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপকেই পাখির চোখ করেছেন রাশিয়ান টেনিস তারকা মারিয়া শারাপোভা। ডোপের দায়ে পনেরো মাসের নির্বাসন কাটিয়ে টেনিস কোর্টে ফিরছেন তিনি। র‍্যাঙ্কিং নেমে যাওয়ায় ফরাসি ওপেন খেলার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ওয়াইল্ড কার্ড পাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। দু'বারের ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়নের ইচ্ছে ছিল রোঁলা গারোর কোর্ট থেকে নতুন করে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের যুদ্ধ শুরু করবেন। কিন্তু তাঁকে ওয়াইল্ড কার্ড দেয়নি ফরাসি ওপেন টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। তাই নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। তবে ফলে আসন্ন উইম্বলডনের ওয়াইল্ড কার্ড পাওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন না মাশা। বরং নির্বাসন কাটিয়ে কয়েকটি টুর্নামেন্ট খেলায় তাঁর র‍্যাঙ্কিং বেড়েছে। তাই কোয়ালিফাইং রাউন্ডের মধ্যে দিয়ে উইম্বলডনের মূলপর্বের লড়াইয়ে ফেরার প্রত্যাশায় শারাপোভা।

ফেরার আশায় পার্থিব

তাঁরই বড় নেতৃত্বে এই মরসুমে রঞ্জি ট্রোফি জিতেছে গুজরাত। সদ্যসমাপ্ত আই পি এল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছনেও রয়েছে তাঁর কৃতিত্ব। তিনি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান পার্থিব পটেল। ইংল্যান্ডে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফিতে কোহলিবাহিনী রওনা হওয়ার আগে অনেকেই ভেবেছিলেন আহত মনীশ পাণ্ডের বদলে ডাক পাবেন পার্থিব। কিন্তু তা হয়নি। ডাক পেয়েছেন দীনেশ কার্তিক। দশম আই পি এল চ্যাম্পিয়ন দল মুম্বইয়ের হয়ে সবচেয়ে বেশি ১৬ ম্যাচে ৩৯৫ রান করেছেন পার্থিব। দলে ভাল-ভাল ব্যাটসম্যান থাকা সত্ত্বেও বহু ম্যাচেই ঝলসে উঠেছে ওপেনার পার্থিবের ব্যাট। দুরন্ত একটা মরসুম শেষ করলেন আবারও। তবু অপেক্ষায় থাকতে হবে তাঁকে। তবে পারফরম্যান্সের জোরে খুব তাড়াতাড়ি ভারতীয় দলে ফিরতে চান পার্থিব।

অবসর নিলেন লাম

বায়ার্ন মিউনিখের ঘরের ছেলে লাম এবার ফুটবলকে বিদায় জানালেন। চলতি মরসুমে শেষবারের মতো বায়ার্নকে বুন্দেশলিগা এনে দিয়ে ফুটবল বুট খুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্বকাপজয়ী জার্মান দলের অধিনায়ক। মাত্র ১১ বছর বয়সে বায়ার্নের আকাদেমিতে এসেছিলেন। সেই শুরু তাঁর ফুটবলার হয়ে ওঠার লড়াই। বায়ার্নের হয়ে ৩৩২টি ম্যাচ খেলেছেন লাম। বহু ট্রোফি জিতেছেন। ২০১৪ সালে ব্রাজিলে তাঁর অধিনায়কত্বে জার্মানি বিশ্বকাপ জয় করে। দীর্ঘ দুই দশকের বিশ্বকাপ ব্যর্থতা কেটেছে তাঁরই হাত ধরে। ৩৩ বছরের লাম বায়ার্নের 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা পাচ্ছেন। তাঁর আগে শেষবার এই সম্মান পেয়েছিলেন ফুটবলার অলিভার কান।

দীপ্তির দাপুটে নজির

ব্যাটে রানের বন্যা ছুটিয়ে একের পর-এক নজির গড়ে ফেলেছেন তিনি। ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান দীপ্তি শর্মা এখন প্রচারের আলোয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিলাদের চার দেশীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট জয় করে ফিরেছে ভারত। চ্যাম্পিয়ন ভারতের বোলার ঝুলন গোস্বামী যেমন মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন, তেমনই দীপ্তি ব্যাটে গড়েছেন দাপুটে নজির। তাঁকে যোগ্য সহায়তা দিয়েছেন ব্যাটসম্যান পুনম রাউথ। দক্ষিণ আফ্রিকায় পোচেসত্রোয় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে দুই ভারতীয় প্রথম উইকেটেই তোলেন ৩২০ রান। যে-কোনও উইকেটে যা বিশ্বরেকর্ড। দীপ্তির ১৮৮ আর পুনমের ১০৯ রানের ধাক্কায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সারা টেলর ও ক্যারোলিনা অ্যাটকিখের গড়া ২৬৮ রানের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে যায়। ১৮৮ রান তোলার পথে ২৭টি বাউন্ডারি মেরে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি মারার নতুন রেকর্ড গড়েছেন দীপ্তি। অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার বেলিন্ডা ক্লার্কের অপরাজিত ২২৯ রানের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলেছেন দীপ্তি। ভারতের জয়া শর্মার ১৩৮ রানের নজিরও ভেঙেছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের ১৯ বছরের বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যানটির চোখে এবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন।

সেঞ্চুরি করলেন সুনীতা

তিনি কোনও ক্রিকেটার নন। ব্যাটহাতে শতরান হাঁকাননি। বরং হকি স্টিক হাতে নিয়ে একশোটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে নজির গড়লেন ভারতের মহিলা হকি দলের রাইট ব্যাক সুনীতা লাকড়া। সদ্য নিউজ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ় খেলতে গিয়ে এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ওড়িশার এক প্রত্যন্ত গ্রামের গরিব কৃষক পরিবারের মেয়ে সুনীতা। বাঁশের তৈরি স্টিক নিয়ে একদিন যাঁর হকি চর্চা শুরু হয়েছিল। রৌউরকেল্লা সাইয়ে এসে খেলোয়াড় হয়ে ওঠার শুরু। ২৬ বছরের মেয়েটি ইঞ্চিয়ন এশিয়ান গেমস এবং রিও অলিম্পিক্‌সেও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এশীয় কাপ জয়ে বড় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সুনীতাকে।

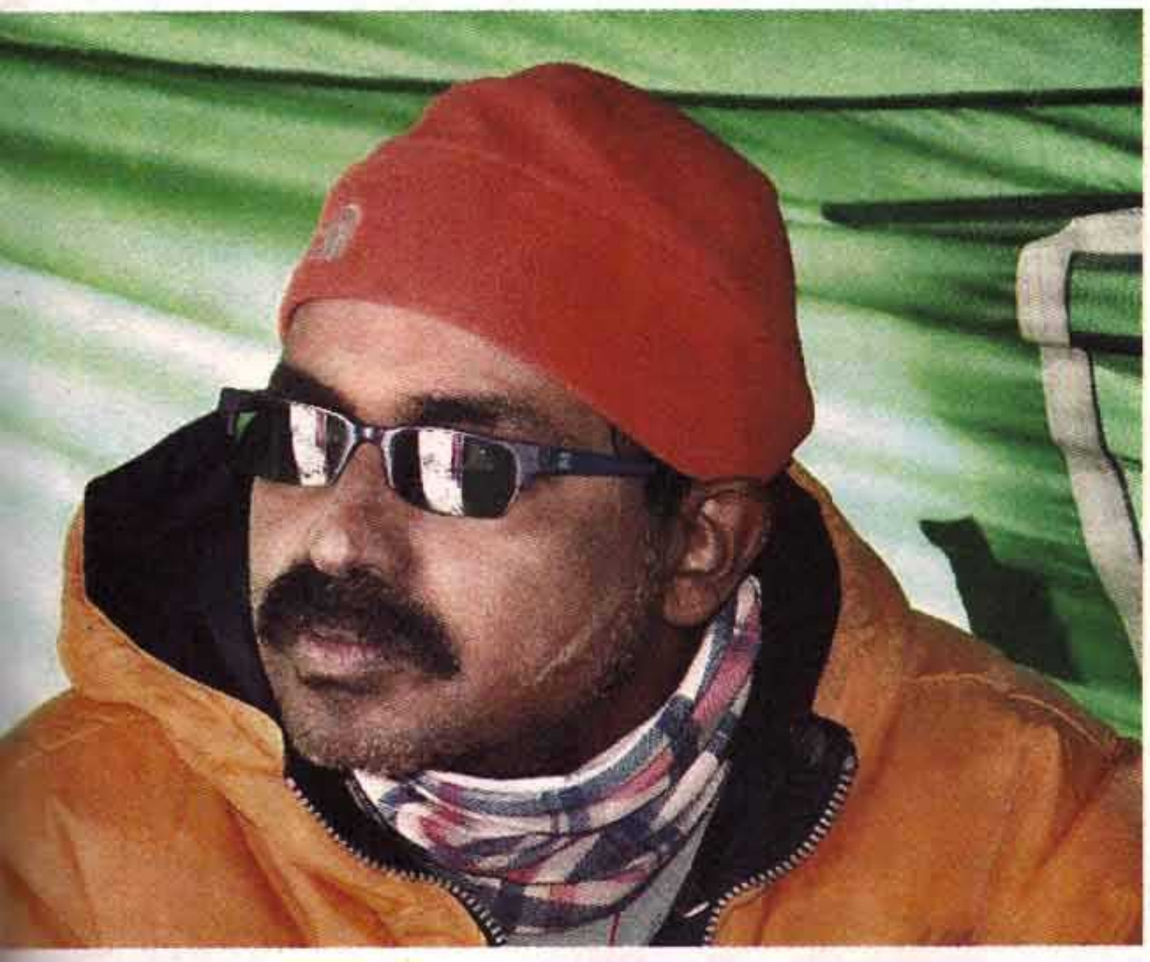

দীপঙ্করের ধৌলাগিরি জয়

হাওড়ার বেলানগরের পর্বতারোহী এভারেস্টজয়ী দীপঙ্কর ঘোষ প্রথম বাঙালি হিসেবে ধৌলাগিরি শৃঙ্গ জয় করলেন। বিশ্বের সপ্তম সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ধৌলাগিরি। ৮,১৬৭ মিটার উচ্চতার এই শৃঙ্গ অভিযানে গিয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন বাংলার এভারেস্টজয়ী দুই পর্বতারোহী বসন্ত সিংহ রায় ও দেবাশিস বিশ্বাস। দু'বছর আগের সেই ঘটনার পর গত বছরই ধৌলাগিরি অভিযানে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন বরাহনগরের রাজীব ভট্টাচার্য। এবারের অভিযানটা তাই দীপঙ্করের কাছে কঠিন এক চ্যালেঞ্জ ছিল। শৃঙ্গ জয়ে গিয়ে প্রবল তুষারঝড়ের কবলে পড়ে প্রথমবার তাঁকে ফিরে আসতে হয়। তারপর প্রকৃতি অনুকূল হলে, সাবধানী দীপঙ্কর দ্বিতীয়বার অভিযান শুরু করেন এবং শৃঙ্গ জয় করেন। এর আগে এভারেস্ট, লোৎসে, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাউন্ট অন্নপূর্ণার মতো শৃঙ্গ জয় করেছেন দেবাশিস।

চন্দন রুদ্র

নতুন খেলা

১

৩

২

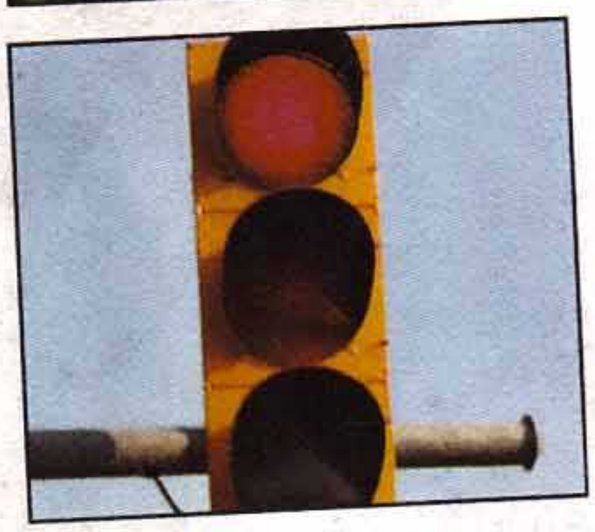

৪

১			
২			
৩			
৪			

ছ	ট	পু	জো
ত্র	য়ো	দ	শ
প	র	মা	ন্ন
তি	মি	মা	ছ

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পরপর খোপে লিখে ফ্যালো। এবার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এবারের সঙ্কেত: পালিয়ে গিয়েছে এমন।

নতুন খেলা বিভাগের উত্তর পাঠাতে গিয়ে তোমরা অনেকেই পুরো পাতাটা ছিঁড়ে পাঠাচ্ছ আনন্দমেলা দফতরে। তার বদলে তোমরা কিন্তু উত্তরগুলো কোনও সাদা কাগজে লিখেও পাঠাতে পার। সাদা কাগজে লেখা উত্তরও বিবেচিত হবে।

৫ মে সংখ্যার সমাধান:

ছ ত্র প তি

Go Figure

÷ × + −

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

সহজ

							=১৩
২		৩		৪		৭	

মাঝামাঝি

							= ১৭
১		৫		৬		১৪	

কঠিন

							= ১৯
৩		৪		৩৮		৫৭	

৫ মে সংখ্যার সমাধান:

সহজ: (২৬×৬)-(১৩×৯) = ৩৯

মাঝামাঝি: (৯×১৫+২৯) ÷ ৪ = ৪১

কঠিন: (২৪×৫)-(১১×৭) = ৪৩

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ২৮ জুনের মধ্যে পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

অর্নেশ বিশ্বাস, তৃতীয় শ্রেণি, আসানসোল এফ. পি. স্কুল, বর্ধমান। **অনন্যা বেরা**, চতুর্থ শ্রেণি, কাঁথি চন্দ্রমণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিভাগ), পূর্ব মেদিনীপুর। **দিশা রায়**, অষ্টম শ্রেণি, নির্মল হৃদয় আশ্রম (বালিকা বিভাগ), পশ্চিম মেদিনীপুর। **ঈশা পাঠক**, ষষ্ঠ শ্রেণি, ঝিলিমিলি হাই স্কুল, বাঁকুড়া। **অলিভিয়া মিত্র**, চতুর্থ শ্রেণি, কাঁথি চন্দ্রমণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিভাগ), পূর্ব মেদিনীপুর। **প্রযত সিমলাই**, অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন, ডানকুনি, হুগলি। **সম্যক দাস**, চতুর্থ শ্রেণি, নব-নালান্দা, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

লিভার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং রোগ প্রতিরোধে ডাঃ সরকারের
৪৮ বছরের আয়ুর্বেদিক গবেষনা ও কোটি কোটি মানুষের ভরসা।

Dr. Sarkar's AllenAyur HERBALS

সুস্থ থাকতে চাই সুস্থ লিভার

আজকের লাইফস্টাইল, খাওয়াদাওয়া, ওষুধ নির্ভরশীল জীবন ক্রমাগত লিভারের ক্ষতি করে চলেছে। প্রতিনিয়ত জন্ডিস, হেপাটাইটিস এবং ফ্যাটি-লিভারের মত মারাত্মক রোগ বাড়ছে।
প্রতিদিন লিভার ৫০০-এর বেশী শারীরবৃত্তীয় কাজ করে।
তাই লিভারের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

LIVOSIN® DS
Herbal Liver Tonic

ডবল্ স্ট্রেংথ - ডবল্ অ্যাকশন্
লিভারের ডবল্ প্রটেকশন্

- ✓ লিভারকে সুরক্ষা দেয় এবং লিভারের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।
- ✓ গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বদ্‌হজম প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- ✓ মদ্যপানজনিত অসুস্থ লিভারকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

* Also available
Livosin Liquid 200ml & 450ml

প্রতিদিন খেলে দুটো ক্যাপসুল...
আপনি থাকবেন বিউটিফুল

LIVOSIN®
আয়ুর্বেদিক হেলথ্ ক্যাপসুল

- লিভারকে সুরক্ষিত রাখে
- রক্তকে শোধন করে
- অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টস্ যোগায়
- প্রাকৃতিক ভিটামিন সরবরাহ করে

আপনাকে দেয় দাগহীন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক!

কোষ্ঠকাঠিন্য নানা রোগের কারণ
মুক্তি পেতে ও প্রতিরোধে

LIVOSIN® BEL
বেল, ইসবগুল, ত্রিফলা ইত্যাদি
ভেষজগুণে সমৃদ্ধ
আয়ুর্বেদিক ল্যাক্সেটিভ

পেট ভাল রাখুন
আর সুস্থ থাকুন।

Allen Group

DISTRIBUTOR'S QUERY / FIELD FORCE REQUIRED
9903466699 / 8334993910

সমস্ত মেডিকেল স্টোরস্-এ পাওয়া যায়।

সর্বরোগে সবার জন্য

ডাঃ সরকার অ্যালেন হলিস্টিক ক্লিনিক অব অ্যাডভান্সড্ হোমিওপ্যাথি

পরিচালনায়- ডাঃ সরকার অ্যালেন ফাউন্ডেশন

প্রখ্যাত চিকিৎসকদের পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Toll Free- 1800 345 2210 / 9874962626 / 033 25717273 | Monday to Saturday, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Allen Appartment, 1st floor, 35, A.P. C. Road, Near Jagat Cinema, Sealdah, Kolkata -700 009

ANANDAMELA 5 JUNE 2017 REGISTERED KOL RMS/236/2016-2018,RNI NO.27057/75 INR 20.00

মা, ঠাকুমার হাতের রান্নার সেই স্বাদ ...
আজকের বাঙালির signature ডিশ্ ...

সানরাইজ®
শুক্তো মশলা

SUNRISE®
PURE

www.strategyadvertising.co.in

লা-জবাব সানরাইজ